লক্ষ্মীছাড়া

ইব্রাহীম খাঁ এম্-এ, বি-এল্

প্রকাশক—
কাজী আকামউদ্দিন
ইতিকথা বুক ডিপো
৮।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলেজ স্কয়ার,
কলিকাতা

[এক টাকা]

প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র সরকার
ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

নিবেদন

এ লেখাগুলি হইতে পাঠক পাঠিকা যদি বাংলার কাঙাল জীবনের একটু অস্পষ্ট ছায়াও পান, তবে উদ্দেশ্য সফল জ্ঞান করিব। ইহার অধিক আশা করা আমার পক্ষে বিড়ম্বনা, কারণ এগুলি আর্ট-সমৃদ্ধ গল্প নয়—সুস্পষ্ট ছবি নয়।

লেখাগুলি অনেকদিন আগেকার এবং বিভিন্ন সাময়িক কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল।

করটীয়া
২২শে চৈত্র, ১৩৪৫।

বিনীত—
ইব্রাহীম খাঁ

উৎসর্গ

—বাংলার কৃষক ভাইদের হাতে—

সূচী

লক্ষ্মীছাড়া

(১)

নোয়াখালীর এক নিভৃত পল্লী হইতে বাবা যখন বদলী হইয়া হুগলী আসিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে আসিয়া এক মহাবিপদে পড়িলাম। এখানে কেহ আমার কদর বোঝে না—কোথায় মুন্সেফ বাবুর ছেলে বলিয়া খেলার সাথীদের সম্ভ্রম, বয়োবৃদ্ধদের আদর ও পাড়ার মেয়েদের কাছে খাবার খাইতে পাইব; না এখানে আমাকে কেহ জিজ্ঞাসাই করে না। দ্বিতীয় বিপদ, স্কুলের শ্রেণীতে কথাটি বলিবার যো নাই। প্রথম দিন দেখিলাম, যেই একটি কথা বলি, অমনই সকলে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে—দুই একটি দুষ্ট ছেলে মুচকি হাসিয়া আপনাদের মধ্যে চুপি চুপি বলে,—'বাঙ্গাল!' দ্বিতীয় দিন আমার কথা লইয়া প্রকাশ্যে ভেংচান শুরু হইল এই শহুরে ওস্তাদ ছেলেদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠি, এ শক্তি আমার ছিল না, তা জানিতাম, তাই কথা বলা বন্ধ করিয়া দিলাম; মনে করিলাম, "আচ্ছা থাক, পড়ার বেলায় দেখা যাবে।"

তিন দিনের মধ্যেই শ্রেণীতে প্রথম স্থান দখল করিলাম। একজন সহপাঠী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আগের স্কুলে কত ছিলে?" আমি সগর্বে উত্তর করিলাম—"ফাষ্ট বয়",—কিন্তু কই, তাহাতেও ত

আদর কদর তেমন কিছু বাড়িল না। এদিকে শ্রেণীতে, খেলার মাঠে, সকল স্থানেই আমার কথা লইয়া ভেংচান চলিতে লাগিল। ভয়ে, শিক্ষক শ্রেণীতে না আসা পর্য্যন্ত আমি ঘরে ঢুকিতাম না।

একদিন শ্রেণীতে ঢুকিয়াই দেখি, এক নূতন ছোকরা এক রূপার মেডাল ঝুলাইয়া আসিয়া জুটিয়াছে; বেশ হৃষ্টপুষ্ট গৌরবর্ণ জোয়ান ছোকরা সে, মাথায় কোঁকড়ান ঢেউ তোলা লম্বা চুল, হাল ফ্যাশান মাফিক ছাঁটা।

রেজেষ্টারীতে নাম ডাকার পর মাষ্টার মহাশয়ের দৃষ্টি তাহার উপরেই আগে পড়িল, কহিলেন, "কিরে লক্ষীছাড়া, এ এক হফ্‌তা কোথায় ছিলি?"

সে মাথায় আঙ্গুল বুলাইতে বুলাইতে উত্তর দিল, "আজ্ঞে, মাষ্টার মশাই; এই রুদ্রপুরে একটা ফুটবল ম্যাচ ছিল।"

"আরে তা'ত আমি আগেই বুঝতে পেরেছি যে একটা ম্যাচ ট্যাচের গন্ধ তুই নিশ্চয়ই পেয়েছিস্‌। তোর বুকে ওটা কিরে? হাঁ, কেল্লা বুঝি ফতে করা হয়েছে? জোয়ান ত হ'য়ে উঠেছিস্ পাঁচ ফিট লম্বা, এখন একটু নিজের বুঝটা বুঝে নে; খেলার ধূমটা কমিয়ে এখন একটু লেখা পড়া কর।" 'লক্ষীছাড়া' ততক্ষণ মাথা নীচু করিয়া পায়ের আঙ্গুলে মাটী খুঁড়িতেছিল।

ঘণ্টা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই একজন সহপাঠী আমার নিকট আসিয়া আমাকে ভেংচান শুরু করিয়া দিল. আর দুই একজন সেই মেডাল-ঝুলান ছোকরার নিকট গিয়া আমার পরিচয় দিয়া কহিল, "আশরাফ ভাই, একেবারে বুনো বাঙ্গাল, একটা কথাও ঠিক করে বলতে পারে না, 'আঁব'কে বলে 'আম', 'ছুঁতোর'কে বলে 'সুতার' আর

'জুতো'কে বলে 'জুতা' ; ওকে নিয়ে আমাদের খুব একটা মজা হবে কিন্তু।''

আশরাফ নীরবে শুনিতেছিল, আর আমার দিকে তাকাইতেছিল। দেখিলাম সে শ্রেণীর সর্দ্দার, মাষ্টারের অনুপস্থিতিতে শ্রেণীতে আশরাফের কথাই আইন।

কিছুক্ষণ পরে সেই প্রতাপশালী সর্দ্দার উঠিয়া আসিয়া আমার নিকট বসিল। বাঁদরের জ্বালাতেই অস্থির, এইবার আবার স্বয়ং হনুমানজী আসিয়া বসিল ঘাড়ের উপর ; আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। মজা দেখিবার জন্য দুই চারি জন আশরাফকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আমিও মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিলাম, কিছুতেই ওর কথার জবাব দেওয়া হবে না।

সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি ?"

আমি সংক্ষেপে উত্তর করিলাম—"হুঁ"।

আমি শুনিতে পাই নাই মনে করিয়া সে আবার জিজ্ঞাসা করিল,—

আমি আবার একটা "হুঁ" করিলাম।

"তোমার বাড়ী কোথায় ?"

"হুঁ"।

"তুমি এখানে ভর্ত্তি হয়েছ ?"

"হুঁ"।

"এখানে কোথায় থাক ?''

"হুঁ"।

পার্শ্বে দাঁড়ান ছোকরারা আশরাফকে এক ছোট্ট ধাক্কা দিয়া চোখ টিপিয়া কহিল, "কেমন, বলেছিলাম যে একেবারে 'ব'এ আকার!" আশরাফ দাঁড়ান ছেলেগুলিকে বিরক্তির সঙ্গে জায়গায় যাইতে আদেশ

শুরু করিল। তাহারা চলিয়া গেলে, সে আবার আমাকে জেরা করিতে শুরু করিল; এবারও আমি কোন উত্তরই দিলাম না। সে একটু ক্ষুন্ন হইয়া চলিয়া গেল।

নিজের ব্যবহার মনে করিয়া আমারও মনে তখন একটু দুঃখ হইল। এক ঘণ্টা পরে যখন আশরাফ আবার আমার নিকট আসিয়া নেহায়েৎ আপন ভাবে এটা ওটা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তখন আমি মুখ খুলিলাম। এবার আমার উত্তর পাইয়া সে আমার পিঠ থাবড়াইয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "বোকা ছেলে, এইত সব বলতে পার, তা এতক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সকলের ভেঙচানী খাচ্ছিলে কেন?" আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, ভেঙচানী এড়াইবার জন্য ও-পন্থা অবলম্বন। সে কহিল, "আচ্ছা, আর কেউ তোমাকে ভেঙচাবে না।"

ইহার পর আর কেহ আমাকে ভেঙচাইতে সাহস পায় নাই।

(২)

এদিকে আমিও তিন চার মাসের মধ্যে 'বাঙ্গাল' ভাষা ছাড়িয়া ওদের 'ঘটি চোর' দেশের ভাষা আয়ত্ত করিয়া ফেলিলাম। আশরাফ আরও নানা উপায়ে আমার নিরানন্দ জীবনকে আনন্দময় করিয়া তুলিল। আমি আস্তে আস্তে ছাত্র সমাজে মিশিয়া পড়িলাম। বাহুবলে আশরাফ শুধু শ্রেণীর নয়, সমস্ত স্কুলের সর্দ্দার, এদিকে পড়াশুনায় আমারও নাম পড়িয়া গেল। বৃষ্টির জন্য বিদায়, ম্যাচ-বিজয়ের ছুটি প্রভৃতির জোগাড় করিত আশরাফ, দরখাস্ত লিখিতাম আমি, আর পেশ করিতাম বিশেষতঃ আমরা দুইজনেই। এইরূপ মৌলুদ, মুহর্‌রম, সরস্বতী পূজা, পুরস্কার বিতরণী সভা প্রভৃতি ব্যাপারে আমরা দুইজন কর্ত্তা হইয়া উঠিলাম।

আশরাফ বড় ভাইয়ের মত আমাকে স্নেহ করিত, আমিও তাহাকে বড় ভাইয়ের মতই মনে মনে সম্মান করিতাম।

মা আমাদের এই ঘনিষ্ঠতার বিষয় জানিতেন। তিনি আশরাফকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন ও মাঝে মাঝেই খাওয়াইতেন। আমরা হিন্দু বলিয়া আশরাফ কখনও আমাদের আদর উপেক্ষা করে নাই। টাউনের সকলেই তাহাকে চিনিত; বয়োবৃদ্ধেরা কেহ আদর করিয়া কেহ বা তিরস্কার করিয়া তাহাকে কখনও কখনও 'লক্ষীছাড়া' বলিয়া ডাকিত; এমন অনেক কাজ সে করিয়া ফেলিত যে সকলে তাহাকে পাগল না বলিয়াও পারিত না।

হুগলী হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরে তাহার বাড়ী, সেখান হইতে আসিয়া যখন সে ভর্ত্তি হয়, তখন তাহার অবস্থা শোচনীয়। খেলায় ও পড়াশুনায় পারদর্শিতা দেখাইয়া সে স্কুল ও বোর্ডিংএ ফ্রি পায়। ইহার প্রায় এক বৎসর পরে, হুগলী যখন কলেরায় উৎসন্ন যাইতেছিল, তখন একদিন সন্ধ্যা রাত্রিতে প্রায় এক মাইল দূর হইতে কলেরায় আক্রান্ত এক 'উড়িয়া' রোগীকে সে কাঁধে বহন করিয়া হাসপাতালে হাজির হইল।

দেখিয়া শুনিয়া বোর্ডিংএর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বলিলেন, "তুমি রোগ ডেকে এনে আমার বোর্ডিংটাকে ধ্বংস করবে, তুমি আজই বের হয়ে যাও।" আশরাফ তখন এক স্থানীয় ভদ্রলোকের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া গ্রামের অনাথ স্কুলে রাত্রে মাষ্টারী আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার নিজের পড়াও স্কুলে চলিতে লাগিল, কিন্তু পড়ার চেয়ে অনাথ স্কুল ও খেলার দিকেই তাহার মন গেল বেশী। মাষ্টারী করিয়া সে বেতন পাইত না, সেক্রেটারী তাহাকে কাপড় চোপড় দিতেন ও বাজে খরচ মাঝে মাঝে

২।৪ টাকা যোগাইতেন। মাতৃহীন আশরাফ যে বিমাতার অত্যাচারে ও বিমাতৃ-বাধ্য পিতার হৃদয়হীন ব্যবহারে গৃহ ছাড়িয়াছিল, তাহা আমি ছাড়া আর কেহ জানিত না। বিমাতার কয়েকটি সন্তান ছিল; পিতা তাহাদিগকে লইয়াই থাকিতেন; আশরাফের খোঁজ খবর লওয়ার প্রয়োজন বোধ করিতেন না।

(৩)

তখন ঈদের ছুটি নিকটে। হেড্ মাষ্টার মহাশয় একদিনের ছুটির নোটীশ দিলেন। আশরাফ দরখাস্ত পেশ করিল, "হয় দুই দিনের ছুটি দিন, না হয় এমনভাবে নোটীশ দিন যে, চাঁদ যেদিন উঠবে, তার পরদিন ছুটি হবে।" হেড্মাষ্টার মহাশয় সে কথা কানে তুলিলেন না; কহিলেন, "ভোরে স্কুল, দরকার হ'লে স্কুলে হাজিরামাত্র দিয়ে গিয়ে ঈদ করতে পার।" ছুটির দিন ঈদ হইল না, চাঁদ একদিন পরে উঠিল। আশরাফ রাত্রিতে চার পাঁচ জন ছেলে সঙ্গে লইয়া ছেলেদের বাড়ী বাড়ী গিয়া তাহাদিগকে পরদিন স্কুলে আসিতে নিষেধ করিল। আমি ভোরে বাসা হইতে পলাইলাম, স্কুলে গেলাম না, অধিকাংশ ছেলেই স্কুলে আসিল না। হেড্ মাষ্টার মহাশয় অনুপস্থিত ছেলেদের প্রত্যেককে একটাকা করিয়া জরিমানা করিলেন, আর বাবাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "আমি কুসঙ্গে পড়িয়া গোল্লায় যাইতে বসিয়াছি।" বাবাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কাজটা করায় বাবা আমাকে তিরস্কার করিলেন, কিন্তু ছেলেদের জরিমানারও প্রতিবাদ করিলেন। হেড্মাষ্টার মহাশয় ছেলেদের জরিমানা মাফ করিয়া দিয়া আশরাফকে দুইদিন বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া রাখিলেন।

(৪)

সেদিন স্কুলের সঙ্গে সেট্‌লমেণ্ট ক্যাম্পের ফুটবল ম্যাচ হইতেছিল। কিছুক্ষণ খেলার পর "ফাউল" লইয়া ঝগড়া বাধিল। সেট্‌লমেণ্ট আম্‌লারা সরকারী চাকর, কাহাকেও বড় পরোয়া করে না; তাহারা স্কুলের ছেলেগণকে শক্ত গালি দিল। আমাদের দলের সর্দ্দার আশরাফ হাজির, সুতরাং বিবাদ মৌখিক হইতে হাতাহাতিতে পরিণত হওয়ার উপক্রম হইল। স্কুলের শিক্ষক সুরেন বাবু উপস্থিত ছিলেন; তিনি মধ্যে পড়িয়া ত্রুটি স্বীকার করতঃ বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। সেট্‌লমেণ্ট আম্‌লাদের রোখ থামিল বটে, কিন্তু তাহারা আর খেলিল না; বকিতে বকিতে ময়দান ছাড়িয়া চলিয়া গেল। আশরাফকে এতক্ষণ দুই তিনটা ছেলে ধরিয়া রাখিয়াছিল, পাছে সে একটা অনর্থ বাধায়। সে ক্রুদ্ধ সর্পের গর্জ্জনের মত সজোরে নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। সুরেন বাবু কহিলেন, "এসব অকাজ এই আশরাফ লক্ষীছাড়ার; নইলে আমি উপস্থিত থাক্‌তে আমারই মাঠে আমারই ছেলেদের মার্‌তে আসে ওরা; এ মার্‌তে আসা ত ছেলেদের নয়, এ আমাকেই মার্‌তে আসা, এ ছেলেদের শিক্ষকের অপমান! আশরাফ একবার হুঙ্কার ছাড়িয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, "কী! আমার জন্য আমার শিক্ষকের অপমান? আচ্ছা, এই সে অপমানের শোধ দিচ্ছি।" বলিয়াই নিকটে দাঁড়ান একটা ছেলের হাত হইতে একটা ছাতা কাড়িয়া লইয়া, যে দিকে তিনজন জয়-দৃপ্ত সেট্‌লমেণ্ট খেলোয়াড় বেড়াইতে গিয়াছিল, সেইদিকে ছুটিল। সুরেন বাবু হাঁকিলেন, "ফিরে আয়, ও আশরাফ ফিরে আয়।" কিন্তু বৃথা! দুই তিনটি ছেলে তাহাকে ধরিবার জন্য পিছু পিছু ছুটিতেছিল, তাহারা ধরিতে পারিল না। সে চক্ষের পলকে যাইয়া সেই তিন জন সেট্‌লমেণ্ট খেলোয়াড়ের উপর

লাফাইয়া পড়িয়া নিদারুণ প্রহার করিতে লাগিল; একজন দুই এক ঘা খাইয়াই পলাইল, আর দুইজন মারের চোটে মাটিতে পড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে স্কুলের ছেলেরা যাইয়া উপস্থিত হইয়া আশরাফকে ধরিয়া আনিল।

শহরময় একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

বন্ধু বান্ধবের অনুরোধ সত্ত্বেও আশরাফ পলাইল না; পরের দিন স্কুলে হাজির হইল। সেইদিনই তাহার বিচার আরম্ভ হইল। সেট্‌লমেণ্ট ডেপুটী সাহেব হেড্ মাষ্টারকে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন, "যদি এর উপযুক্ত বিচার না হয়, তবে আমি সুরেন বাবু ও ছেলেদের নামে ফৌজদারী করব। কেবল স্কুলের হিতের দিকে চেয়ে আমি আপনাকে এই বিচারের সুযোগ দিলুম।" সুরেন বাবু সস্‌পেণ্ড হইলেন, আশরাফের সঙ্গী সাতজন ছেলের পাঁচ পাঁচ বেত হইল, আর আশরাফের সম্বন্ধে হুকুম হইল, 'সমস্ত স্কুলের সম্মুখে আশরাফের পঞ্চাশ বেত হইবে।' হেড্ মাষ্টার মশাইর সঙ্গে ঈদের ছুটি লইয়া আগেই আশরাফের খিটিমিটি বাধিয়াছিল, তাহার উপর এই নূতন অপরাধ; সুতরাং সমস্ত আক্রোশ তাহার উপর গিয়াই পড়িল।

স্কুলের সম্মুখভাগে স্কুলের সব ছেলে, শিক্ষক ও কমিটীর কয়েকজন মেম্বর সমবেত হইলেন; আশরাফের অনাথ স্কুলের ছেলেও দুই চারজন আসিয়া জুটিয়াছিল। তাহাদের মধ্যেই আশরাফকে লইয়া আসা হইল, বেত মারার জন্য। ছেলেদের আর যাহাতে এরূপ অপরাধ না হয়, সে সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া হেড্ মাষ্টার মহাশয় এক বক্তৃতা করিলেন; তৎপর স্কুলের অষ্টম মাষ্টার কালী বাবুকে বেত মারিতে আদেশ দিলেন।

সেদিন যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, বুঝি আর সেরূপ দেখি নাই। কালী

বাবুর হাতে বেত; সম্মুখে জনসঙ্ঘ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশের জন্য নয়, তাহারই অপমান শতগুণে বর্দ্ধন করিতে; আর সেই সমস্ত অপমান সম্মুখে লইয়া, নীরব, নির্ভীক আশরাফ দণ্ডায়মান! তাহার মুখমণ্ডল অস্বাভাবিকরূপে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তথায় বিষাদ-কালিমা বা কাতরতার চিহ্নমাত্র নাই! সহস্র চক্ষুর দৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া আজি আমাদের 'লক্ষ্মীছাড়া', কুস্তীর ওস্তাদ, খেলার সর্দ্দার, শান্ত, দৃপ্ত, মহিমময় আশরাফ!

কালী বাবু বেত হাতে অগ্রসর হইলেন; কাছে যাইতেই আশরাফ ধীর কিন্তু দৃঢ়স্বরে কহিল, "মাষ্টার মশাই, আপনি আমাকে মারতে পারবেন না, যান।" হেড্ মাষ্টার মহাশয় গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "মারতে পারবেন না, মানে কি আশরাফ? তুমি কি বলতে চাও?" তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে আশরাফ কহিল, "হেড্ মাষ্টার মশাই, আজ আপনাকে আমার একটা নিবেদন রাখতে হবে:—আপনি নিজে বেত মারুন, কালী বাবুর কাছে আমি কখনো পড়ি নাই, তিনি বেত মারতে পারবেন না।" হেড্ মাষ্টার মহাশয় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "কি? এখানে আমাদের আদেশ প্রবল, না তোমার আদেশ? দফতরী, তুমি চাবকাও" বলিয়া দফতরীর হাতে বেত গুঁজিয়া দিলেন; বেচারা হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাষ্টার মহাশয় তাহাকে আশরাফের দিকে ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, "আমার হুকুম, বেত মার।" এবার আশরাফও গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "খবরদার, দফতরী, কাছে এস ত মাথার খুলী থাকবে না কিন্তু।" দর্শকদের মধ্যে তখন কেমন একটা অস্বস্তির মৃদু গুঞ্জন জাগিয়া উঠিয়াছে। স্কুলের একজন প্রবীণ মেম্বর কহিলেন, "মাষ্টার মশাই, আপনি নিজে যান, দফতরীর বেত মারার অধিকার নাই।" তখন হেড্ মাষ্টার মহাশয়

নিজে যাইয়া বেত মারিতে লাগিলেন। এক, দুই, তিন—হাতে, পিঠে, পায়ে ক্রুদ্ধ হস্তের নিষ্ঠুর বেত শপাশপ পড়িতে লাগিল; আশরাফ তেমনি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। 'পঞ্চাশ' শেষ করিয়া মাষ্টার মহাশয় থামিলেন; আশরাফ বসিয়া মাষ্টার মহাশয়ের দুই পা ছুঁইয়া ছালাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও উপস্থিত সকলকে পুনরায় হাত তুলিয়া নীরবে ছালাম করিয়া গর্ব্বিত পদক্ষেপে সভাস্থল ত্যাগ করিল, নিজে কিছু কহিল না, অপর কাহাকেও কিছু কহিবার অবসর দিল না।

পরদিন ভোরে উঠিয়া তাহাকে হুগলীতে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

(৫)

পাঁচ বৎসর পরে আমি কলিকাতায় বি, এ, পড়িতেছি। অনাবৃষ্টিতে বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ; কলিকাতা হইতে অনেক মিশন গিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্য করিতেছে। আমিও তাহারই এক মিশনে বাঁকুড়া গেলাম। দেখিলাম, মাঠে শস্য নাই, যাহা ছিল, পুড়িয়া খড় হইয়া গিয়াছে; পথের দূর্ব্বাঘাসে আগুন দিলে জ্বলে; অধিবাসীরা কঙ্কালসার, সহসা দেখিলে ভয় হয়। মিশনের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "লোকের সাধারণ অবস্থা কেমন?" তিনি কহিলেন, "যেমন দেখিতেছেন সবই এমনি কঙ্কালসার; এর উপর আবার ছোটখাট চুরি ডাকাতি; যার ঘরে যা আছে, অন্যে তা গোপনে না পারে ত জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে খায়। একজন স্থানীয় লোক মিশনের মেম্বর হ'য়ে টাকা পয়সা নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। সেদিন আর এক প্রবঞ্চক এসেছিল মেম্বর হ'তে; তার একটা ছার্টিফিকেট পর্য্যন্ত নাই, চেহারা রোগা; তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। দায়ে

প'ড়ে এসব করে, তার কি করা যায়। কাল আবার তার সংবাদ পাওয়া গেল, এখান হ'তে ৫।৬ মাইল দূরে কাঞ্চনপুরে সে চুরি করেছে। কলেরায় সে গ্রাম প্রায় উৎসন্ন। মৃত ও অর্দ্ধমৃতদের ছেড়ে লোক পালায়, সে তাদের নিকট যা পায়, খসিয়ে নেয়। আপনাদের সেখানে ক্যাম্প ক'রে কাজ করতে হবে। আর যদি পারেন, সে লোকটাকেও পুলিসের হাতে ধরে দিতে হবে।"

কাঞ্চনপুর যাইয়া কলেরা ও দুর্ভিক্ষ উভয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে লাগিলাম। ঘরে ঘরে মরা, টানিয়া ফেলিবার লোক নাই। যথাসাধ্য কাজ করিতে লাগিলাম। গ্রামের লোক সন্ধ্যার পর বাড়ীর বাহির হইতে নারাজ, শুশ্রূষা করিতে জানে না, করিবার ইচ্ছাও ততোধিক বিরল। তবু অনেক বলিয়া কহিয়া তাহাদিগকেই লইয়া কিছু কিছু কাজ চলিল। এক বাড়ী যাইয়া দেখিলাম, সবগুলি ঘর খালি, কেবল একটি ঘরে মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ শোনা যাইতেছে। রোগীর পায়ে কুষ্ঠ, তাহার দুই দিকে দুইটি মৃত দেহ। তখনও তাহার ঘন ঘন বমন হইতেছে, চারিদিকে ময়লা; সেগুলি যথাসাধ্য পরিষ্কার করিয়া, ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া, মিশনের একজনকে সেখানে রাখিয়া আসিলাম। গ্রামের লোক মিশনে যাহারা ছিল, তাহারা কেহ তাহার নিকট যায় না, বলে, "চোরের মৃত্যু এইরূপই হয়, একদিন আগেও সে মৃতের গাঁট কেটেছে।"

গ্রামের অন্য একটি বাড়ী যাইয়া দেখি, তেমনি চারিটি রোগী এক ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে গড়াগড়ি দিতেছে, এক বৃদ্ধ মুমূর্ষু পত্নী ও দুইটি ছেলেকে বুকে করিয়া নিজেও মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, দুই দিন যাবৎ অভাগারা কিছুই খায় নাই, আগে একটা লোক তাহাদিগকে কিছু খাইতে দিত, দুই দিন হইল, তাহারও কলেরা

হইয়াছে'। জিজ্ঞাসা করিলাম, সে লোকটা কে? "ঐ যে, ঐ বাড়ীতে যে একটা লোক্ থাকে; সে কি এখনো আছে?" গ্রামের সঙ্গীটি কহিল, "ও বাড়ীতে ত আর কেউ নাই, সেই চোরটা আছে মাত্র।" রোগী কহিল, "চোর হইলে কি হয়, বাবা; ওর মনে যে দয়া আছে, তা অনেক ভাল মানুষের নাই। ও চুরি ক'রে মরা মানুষের গাঁট কেটে যা পেয়েছে, তা দিয়ে আমাদেরকে কয়দিন খাইয়েছে। আরো অনেককেও সে এই উপায়ে খেতে দিত, শুনেছি।"

হায়রে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ! দুস্থ, মৃত ও অৰ্দ্ধমৃতদের নিকট হইতেও যে নর-পিশাচ অপহরণ করে, তাহার পাষাণ হৃদয়ও তুমি দ্রব করিতে পারিয়াছ!!

গ্রামের ঘরে ঘরেই এইরূপ মৃত বা অৰ্দ্ধমৃত। প্রথম দিন আমাদিগকে এক গ্রামের কাজ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হইল; পর দিনও আবার তথাকার রোগীগুলি দেখিতে গেলাম। কাল যাহাদিগকে দেখিয়া আসিয়াছি, আজ তাহাদের অনেকে চলিয়া গিয়াছে; মৃত্যু পথের নূতন যাত্রী তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। বৃদ্ধটি তাহার পুত্র বনিতাসহ মহাপ্রস্থান করিয়াছে; পাশের বাড়ীর রোগীটিও নাই, তাহার চৌৰ্য্যবৃত্তির পরিসমাপ্তি হইয়াছে। সে পাড়ায় মিশনের যে মেম্বর সেবা শুশ্রূষার কাজ করিতেছেন, তিনি আমার হাতে একখানা পত্র দিয়া কহিলেন, "এ পত্র এই মৃতের; ইহাতে তাহার নাম ধাম আছে. পড়িয়া পত্রটা ডাক ঘরে দিতে হইবে।" আমরা মৃতদের নাম ধামের এক তালিকা রাখিতাম। পত্রের ঠিকানাটা আমার এক কৈশোর-স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত, খুলিয়া পড়িলাম:—

"বাবা!

মৃত্যুর পূর্ব্বে পিতৃদ্রোহী পুত্র শেষ ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছে। যখন প্রবাসেও নানা অত্যাচারে জীবনের বোঝাটা বড় বেশী ভার বোধ হইয়াছিল, তখন একদিন ভাবিয়াছিলাম, তীক্ষ্ণ ছুরিকার এক আঘাতেই এভার লঘু করিয়া দেই। কিন্তু দেখিলাম এ দুনিয়ায় আমার চেয়েও কত দীনহীন কাঙাল দুঃখী আছে—সিন্দুরের কুষ্ঠ আশ্রমে শত শত রোগী অনুদিন পচিয়া গলিয়া মরিতেছে; তাহাদেরই সেবায় আত্মনিয়োগ করিলাম। সেখানে থাকিতে কতবার মনে করিয়াছি, একবার আসিয়া আপনার পদতলে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া যাই; কিন্তু আশ্রমের কুষ্ঠ-ব্যাধি আমাকেও আক্রমণ করিয়া বসিল, আর গৃহে ফিরিতে সাহস হইল না। বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্যে আসিয়াছিলাম; বিদেশী, ঘৃণিত রোগাক্রান্ত, অর্থবলহীন বলিয়া কাহারও বিশ্বাসভাজন হইতে পারি নাই। একা সহস্র লোকের সন্দেহের পাত্র হইয়া কাজ করিতেছিলাম, তাহাও বন্ধ হইল; আজ কলেরায় ধরিয়াছে। বোধ হয়, শীঘ্রই জীবনের সমস্ত দুঃখের অবসান হইবে। আপনি যখন এ পত্র পাইবেন, তখন আমি এ জগত হইতে অনেক দূরে—আমি জীবিত থাকিতে এ পত্র ডাক ঘরে যাইবে না।

আপনার অধম পুত্র

“আশরাফ।”

আষাঢ়, ১৩২৫

নূতন বাড়ী

(১)

গোয়ালপাড়া বাড়ী করিয়া আট মাস পরে সিরাজ শেখ যখন স্ত্রী রহিমা ও সাত বৎসরের কন্যা হালিমাকে লইয়া যাইতে ঘরে ফিরিল, তখন পাড়ায় একটা সাড়া পড়িয়া গেল। কেহ কহিল, সিরাজ মস্ত জোতদার হইয়া আসিল, দুই এক বৎসরের মধ্যে কুঠিয়াল ধনী হইয়া যাইবে; বৃদ্ধ কাদের শেখ পাকা দাড়িতে গম্ভীরভাবে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "সবই খোদার কুদরত, ভাই, খোদার কুদরত! আমার বয়সেই দেখ্‌লাম, ওর বাপের বাড়ীতে কত লোক খেয়ে প'রে মানুষ হয়ে গেল, আবার ওকে পরের বাড়ী জন-মজুর হ'য়ে খেটে খেতেও দেখলাম; আজ আবার শুনি সিরাজ মস্ত জোতদার; তা ওর বাপের নেকীর ফলটা কোথায় যাবে, বল?" যুবকদের মধ্যে কেহ মাতাপিতার প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিল, "আমরাও বলেছিলাম, এই মরার দেশ ছেড়ে উত্তরে আসামে কি কুচবিহারে কোথাও যেয়ে একটা বাড়ী করি, তা যেতে দেবেন কেন? যেন এই বাপদাদার ভিটার মাটী চেটে খেলেই পেটের ক্ষিধে যাবে!" এরফান মোল্লা উত্তরে কহিল, "তা ভাই যে ভাত, ও খাওয়ার চেয়ে পেট বেঁধে দেশে পড়ে থাকা ঢের ভাল; ছয় মাস থাকতে হয় কাঁথার তলে, তা ভাত খাবেই বা কখন? দেখ ত ধীরে ধীরে সিরাজের চেহারাটা কেমন কাল ছাই হয়ে গিয়েছে। পেটটা যেন একটা আস্ত হাঁড়ি!" সত্য সত্যই পাহাড়ে হাওয়ায় ও প্রথম এক মাসের জ্বরে সিরাজের চেহারাটা কাল হইয়া গিয়াছিল, আর তাহার পেটটাও অলক্ষ্যে হাঁড়ির আকার ধারণ

করার একটা ষড়যন্ত্র শুরু করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু গায়ের রং ও উদরের আকৃতি বিকৃত হইলেও তাহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে একটা আনন্দের ঢেউ নাচিয়া বেড়াইতেছিল ; চক্ষু নির্ম্মল ও পুলক-জ্যোতিতে ভরিয়া গিয়াছিল। সে পাড়ার বাড়ী বাড়ী বেড়াইয়া গল্প করিতেছিল, যে দেশে সে বাড়ী করিয়াছে, সেখানে কেমন দুই চাষেই জমি তৈরী হয়, ধান ছড়াইয়া রাখিলেই কেমন সোণা ফলিয়া থাকে, মাঝে মাঝে কেমন জঙ্গলা মহিষ আসিয়া ক্ষেত চড়াও ক'রে, সন্ধ্যার পরেই কেমন বাড়ীর চারিদিকে বাঘের ডাক শোনা যায়, একদিন সে কেমন করিয়া বাছুর লইয়া বাঘের সাথে লড়াই করিয়াছিল, বাঘ ঘরের বেড়ার ভিতর হাত দিয়া বাছুর ধরিয়া টানিতেছিল, আর সে ভিতর হইতে বাছুরের মাথা ধরিয়া টানিতেছিল, ইত্যাদি। সিরাজের স্ত্রী রহিমারও আনন্দের সীমা ছিল না, তবে সে আনন্দের উপর একটা বিষাদের ছায়া ছিল। তাহাকে তাহার বাপ মা, শ্বশুরের দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এই কথা মনে করিয়া সে প্রতিবেশিনীগণের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে মাঝে মাঝে চক্ষু মুছিতেছিল। কাল যাহার সঙ্গে রহিমা ঘণ্টাভর কোন্দল করিয়াছে, আজ সেও আসিয়া জুটিয়াছে, রহিমা তাহাকে পান দিতেছে, সাদর সম্ভাষণ করিতেছে, সেও আজ সমস্ত ভুলিয়া গিয়া বিদায়ের বিষাদের ভাগ গ্রহণ করিতেছে। দুঃখের দিনে এ জগতে মেয়েদের মত সহানুভূতি আর কেহ দেখাইতে জানে না।

(২)

"আমি কিন্তু যাবনা, বাবা—।" রাত দশটা, তখনও হালিমা শুইতে যায় নাই ; বৈকালে মা'র মুখে নূতন বাড়ী যাওয়ার কথা শুনিয়া অবধি

সে জেদ ধরিয়াছে, বাবার কাছে অহার নূতন বাড়ী যাওয়ার অসম্মতির কথা না জানাইয়া সে ঘুমাইবে না, কিন্তু বসিয়া বসিয়া মা'র কোলে মাথা রাখিয়া কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সিরাজের ঘরে ঢোকার শব্দে জাগিয়া উঠিয়াই ঘুম ভরা চোখে সে বলিল, "আমি কিন্তু যাব না, বাবা, মাকেও যেতে দিব না।" হালিমাকে কোলে টানিয়া লইয়া স্নেহের স্বরে সিরাজ, কহিল, "কোথায় যাবি নারে পাগলী?" "সেই নূতন বাড়ী; ও বাড়ীর খাতেমনের কাছে আমার সেই ছোট্ট পুতুলটার কাল বিয়ে দিয়েছি, তার ফিরাণী আনতে হবে, মেহ্‌মানী দিতে হবে, আরো কত কি করতে হবে। আমি গেলে সেগুলি কে করবে, কি বল, মা? তা বাবা, তুমি সে কথা স্বীকার না করলে আমি ঘুমাব না।" সিরাজ সস্নেহে হালিমাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুমা খাইতে খাইতে কহিল, 'তা তুমি না গেলে মা, এখন যাও ঘুমাওগে সোণা আমার।" হালিমা বিজয়ের গর্ব্বে তাহার ছোট্ট মুখখানি উজ্জ্বল করিয়া শুইতে গেল। রাত্রে স্বামীস্ত্রীতে অনেক কথাবার্ত্তা হইল,—দেশের দুঃখ-দৈন্যের কথা, নূতন বাড়ীর ভবিষ্যৎ সুখ সৌভাগ্যের কথা, শেষে বিদায়ের কথা। বিদায়ের কথা পাড়িতেই রহিমা কাঁদিয়া ফেলিল, সিরাজও কাঁদিল। যুগযুগান্তরের বাপদাদার দেশ, তাহার পূর্ব্ব পুরুষেরা প্রত্যেকে বাড়ীর বিভিন্ন স্থানে কবরস্থ থাকিয়া যেন সমাধিলগ্ন দরবেশের মত দুঃখ দৈন্যের হাহাকারের মধ্যে সিরাজের পরিবারকে পাহারা দিতেছেন, কাল তাহারা চলিয়া গেলে আর সে সমাধিপারে কোন মৌলবী মুন্সী দোওয়া দরুদ পড়িবে না, বাপদাদার হাতের আম কাটালের গাছগুলি পড়িয়া থাকিবে, আর এই আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ছাড়িয়া এক বুনো জায়গায় যাইয়া বাঘ ভালুকের সঙ্গে বাস করিতে হইবে—হায় রে পেট! এইরূপ সুখ দুঃখের আলাপের পর উভয়ে স্থির করিল, কাল ঈদের পর একবার

চিরদিনের মত শেষ বার মুরুব্বীদের গোর জিয়ারত করিতে হইবে।

(৩)

পথে পথে লোক চলিতেছে; বৃদ্ধেরা দোওয়া পড়িতে পড়িতে, যুবকেরা দোওয়ার পর আলাপ ও আলাপের পর দোওয়া আওড়াইতে আওড়াইতে, বালকেরা চেঁচামেচি করিতে করিতে দলে দলে, দলে দলে চলিতেছে; সকলেরই গায়ে পরিচ্ছন্ন বেশ, মাথায় টুপী, প্রাণে আনন্দ, বদনে হাসি, মুখে খোদার নাম। আজ ঈদ। পাড়ার সকলেই ঈদের মাঠে চলিয়া গেল, বাকী রহিল শুধু সিরাজ। ভোরে উঠিয়া এ কাজ সে কাজ করিতে করিতে বেলা হইয়া গেল, তখন সে আগের হাটে কেনা বাছুরটা ধোয়াইয়া আনিল। রহিমা নাশ্‌তা তৈয়ার করিয়াছিল, হালিমা তাহাই খাইতেছিল, সিরাজ কোরবাণীর আগে কিছু খাইবে না, সুতরাং রহিমাও খাইবে না। সিরাজ কাপড় চোপড় পরিয়া যখন অজু করিতেছিল, তখন বাহিরে শব্দ শোনা গেল; সিরাজ মনে করিল কেহ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, এক সঙ্গে নামাজ পড়িতে যাইবে। সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল; দেখিল, তাহার মহাজন বলাই সরকারের মুহুরী হরিনাথ ও লাঠি হাতে তিনজন পশ্চিমা দেশওয়ালী; তাহাদের একজন সিরাজের বাছুরটার দড়ি ধরিয়া আছে। তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল, মুখে কথা সরিতেছিল না, তবু জোর করিয়া হরিনাথকে এক সেলাম ঠুকিয়া কহিল, "তা—বাবু—আজ—ঈদের দিন—"; সিরাজের কথা শেষ না হইতেই হরিনাথ কহিল, "হাঁ তা বটে, আজ ঈদের দিন। তুমিও অনেক দিন পর বাড়ী এসেছ শুনলাম, তাই মনে করলাম,

অনেক দিনের পুরাতন খাতক, একটু দেখা করেও আসি; আর একটু কাজ ছিল, সে লেঠাটাও সেরে আসা যা'ক। তোমার সেই পাঁচ টাকার দেনাটা যে আঠার টাকায় উঠেছিল, তার জন্য একটা নিলাম আছে, তোমার মনে থাকতে পারে। এই গরুটা এখন নিলাম করছি, তা তোমাকে না জানায়ে ত নেওয়া যায় না—হিরালাল চল।" হিরালাল সিং গরু লইয়া চলিল; "এবার মাফ করুন, বাবু" বলিয়া সিরাজ যাইয়া গরুর দড়ি ধরিল, হিরালাল সজোরে ধাক্কা দিয়া সিরাজকে ছাড়াইয়া দিল। সিরাজ পড়িতে পড়িতে উঠিয়া আবার যাইয়া হরিনাথের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "বাবু, আপনি আমার মা বাপ, আজ বাঁচিয়ে যান; এই বাছুরটা আমি খোদার নামে কোরবাণীর জন্য কাল কিনে এনেছি, একে রেখে যান।" হরিনাথ গর্জ্জিয়া উঠিল, "পা ছাড়, হারামজাদা, মহাজনের টাকা খেয়ে যে ব্যাটার এক পয়সা দিবার মুরদ নাই, তার আবার কোরবাণী।" জহরলাল সিং সিরাজের পিঠে একটা লাঠির ঘা মারিতে যাইতেছিল, হরিনাথ তাহাকে ইশারায় সরাইয়া দিল। সিরাজ উঠিয়া কহিল, "বাবু, নূতন বাড়ীতে আমার পাঁচশ টাকার ক্ষেত হবে; এ বাড়ীঘর, দুই 'পাখী' জমি, তাও ত সব রইল, আপনার টাকা আমি সময় মত দিব।" হরিনাথ মুখ খিচাইয়া কহিল, "আজ্ঞে হুজুর, এই পাঁচ গণ্ডা টাকার জন্য আমি পাহাড় পর্ব্বত ভেঙ্গে আপনার বাড়ী যাব, না এই বাড়ীঘর ধুয়ে খেলেই মহাজনের পাওনা মিটবে; পথ ছাড়।" সিরাজ পথ ছাড়িল না, কহিল, "আজ কিছু দিয়ে দেই, গরুটা আমার রেখে যান।" হরিনাথ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া কহিল, "তবে নিয়ে এস।" সিরাজ ঘর হইতে তিনটা টাকা লইয়া গেল, হরিনাথ টাকা হাতে লইয়া কহিল, "হিরালাল, গরু

ল'য়ে চল, বাছুর নয় টাকা, আর এই তিন টাকা, মোট বার টাকা শোধ হ'ল; অবশিষ্ট ছয় টাকা কাল ঐ ঘরখানা বেচে আদায় হয়ে যাবে।" সিরাজ কতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ "আচ্ছা দাঁড়াও শালারা, কার গরু কে নেয়, আজ একবার দেখিয়ে দেব" বলিয়াই বাড়ীর ভিতরে গিয়া একখানা দা লইয়া ছুটিল। বাড়ীতে তখন এই গোলমালে কয়েকটি প্রতিবেশীর সমাগম হইয়াছিল; সিরাজ দা লইয়া ছুটিতেই রহিমা তাহাকে যাইয়া ধরিয়া ফেলিল, আরও দুইজন বৃদ্ধা তাহাকে ধরিল। এদিকে বাইরে দেশওয়ালীরা "বাহার আও সালে" বলিয়া হুঙ্কার দিয়া দাঁড়াইল। দুই তিনজন স্ত্রীলোক বাহিরে যাইয়া তাহাদিগকে অনুনয় বিনয় করিয়া কহিল। হরিনাথ দেশওয়ালীগণকে ডাকিয়া গরুসহ চলিয়া গেল; অনেক দূর পর্য্যন্ত সিরাজের প্রতি দেশওয়ালীগণের নিকট আত্মীয়তাবোধক সম্বোধন শোনা যাইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে সিরাজ দা ছাড়িয়া বসিয়া বালকের মত হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন ঈদের নামাজের সময় যায় যায়, মেয়েরা কহিয়া বলিয়া তাহাকে ঈদের মাঠে পাঠাইয়া দিল। সমস্ত মাঠের মধ্যে শুধু সিরাজ বিষণ্ণচিত্তে নামাজ পড়িল, কিন্তু এমন নামাজ সে জীবনে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও পড়ে নাই।

(৪)

সিরাজের বড় রাগ হইয়াছিল, রাগের অধিক দুঃখ হইয়াছিল; কিন্তু সকল দুঃখ, সকল রাগ ম্লান করিয়া তাহার মানসচক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছিল শুধু তাহার সেই নূতন বাড়ীর ভবিষ্যৎ সুখ সৌভাগ্যের কল্পনা অনুরঞ্জিত উজ্জ্বল ছবিখানি। পথে আসিতে আসিতে সে

সঙ্গীদের সঙ্গে বেশ আলাপ করিতেছিল, মহাজনের গরু কাড়িয়া লওয়ার কথা কাহাকেও জানাইল না। বাড়ী আসিয়া দেখিল, রহিমা সেই ভোরে-পাক-করা নাশ্‌তা লইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সিরাজ খাইতে বসিলে রহিমা অন্য ঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "ভাতের চাল নাই, কেমন হবে?"

আশ্চর্য্য বোধ করিয়া সিরাজ কহিল, "কেন, চাল ত ছিল?"

রহিমা কহিল, "ছিল, এখন নাই; গরুর গোলমালে যখন আমি ওখানে ছিলাম, তখন বোধ হয় কুকুরে এসে খেয়ে গিয়েছে।" সিরাজ নীরবে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া হাত ধুইয়া ফেলিল।

রহিমা কহিল, "হাত ধোও কেন, নাশ্‌তা রইল যে!"

"ও হালিমা খাবে, আমার পেট ভরেছে।"

"না, তা হবে না, তুমি সারাদিন কিছু খাও নাই, ওটুকু তুমি খাও, হালিমার জন্য আরো আছে। আর চাল নাই, সেজন্য তুমি অমন ফাঁৎ করে নিশ্বাস ফেল্লে কেন? আমি এখনই চাল কর্জ্জ করে নিয়ে আসছি।"

"তুমি আজ চাল কর্জ্জের জন্য কোথাও যেতে পারবে না, রহিমা; অনেক দিন কর্জ্জ, ভিক্ষা করে ত খেয়েছি; আজ ঈদের দিন কারো দুয়ারে ভিখারী হব না। যে নাশ্‌তা আছে, তুমি ও হালিমা খাও; আমার জন্য ভেবো না; রাত্রির ভাবনা?—তা এ যাবত নিজের উপর নির্ভর ক'রে দেখলাম, পেট ভ'রে খেতে পেলাম না; আজ ঈদের দিন, দেখি খোদা আজ আমাকে কি খাওয়ায়?" সিরাজের গম্ভীর কম্পিত কণ্ঠ শুনিয়া রহিমা চমকিয়া উঠিল।

(৫)

তখন জুমা ঘরের সম্মুখভাগ লোকে লোকারণ্য ; দশ বারটা কোরবাণী হইয়া গিয়াছে ; গ্রামের বালক, বৃদ্ধ যুবা সকলে মিলিয়া আনন্দে কোলাহল করিতেছে, কেবল নাই আজ সেখানে সিরাজ। পাড়া প্রতিবেশী যখন সিরাজের খোঁজ লইল, তখন সে বাজারে চলিয়া গিয়াছে। রহিমা ঝাপি ঝাড়িয়া তিন আনা পয়সা পাইয়াছিল ; তাহাই আনিয়া স্বামীর হাতে দিয়া কহিল, "গোলা হ'তে চা'ল নিয়ে এস।"

"এতে কি মিলবে ?"

"আজ এতেই চলবে ; আজ এখন কেউ বাড়ী নাই ; কাল আমার বালা জোড়া বন্ধক দিলে কিছু মিলবে।"

সিরাজ নীরবে রহিমার দিকে চাহিল, চাহিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল ; পরে নিঃশব্দে উঠিয়া বাজারে চলিয়া গেল। সেখানে গোলাঘরে সওয়া সের চা'ল কিনিয়া রওনা হইবে, এমন সময় গোলাদার কালাচাঁদ কহিল, "সিরাজ ভাই, আট আনা পয়সা যে পাওনা ছিল ? মনে আছে, সেই কাপড়ের পয়সা ?"

সিরাজ কহিল, "হাঁ, তা মনে আছে, দাদা, তবে আজ থাক, আর একদিন দিয়ে দিব।"

গ্রাহকদের মধ্য হইতে কেতু মাঝি কহিল, "তা সিরাজ ভাই নাকি আমাদের ছেড়ে দেশ হ'তে চলে যাচ্ছ ? কাল নাকি রওনা হবে ? খেত খোলা ওখানে কেমন দেখা যায় ?"

কালাচাঁদ শুনিয়া আঁটিয়া ধরিল, এমন পলায়নপর বাকীদারকে ত ছাড়া যায় না ; সে সিরাজের হাত হইতে পুঁটুলিটা নিয়া চাল ঢালিয়া

ফেলিল। সিরাজ নীরবে উঠিয়া গামছাখানা লইয়া বাড়ী চলিল। মেঘা মণ্ডল কহিল, "কালাচাঁদ দা, কাজটা ভাল হ'ল না;" কালাচাঁদ হাসিমুখে অন্য আলাপ জুড়িল।

সিরাজের বাড়ী আসার পথে মাঠের মধ্যে একটা বটগাছ; প্রতিদিন দলে দলে রাখাল বালকেরা আসিয়া তাহার নীচে বসে, হাসে, খেলে, চেচ্চামেচি করে, মারামারি বাধায়; কৃষকেরা রৌদ্র হইতে আসিয়া তথায় হুঁকা টানে, পথিকেরা বিশ্রাম করে ও কৃষকদের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতিয়া তাহাদের হুঁকার প্রসাদ গ্রহণ করে; কিন্তু আজ সে স্থান জনপ্রাণীশূন্য, কেননা আজ সকলে গ্রামে ঈদের আনন্দে মত্ত। কাক চিলগুলি পর্য্যন্ত আজ এ গাছ ছাড়িয়া যেন ঈদের আনন্দে যোগ দিতে জুমা ঘরের কাছে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ স্বরে কোলাহল করিতেছে! সিরাজ সেই গাছতলায় আসিয়া বসিল, বসিয়া দুই হাতে মুখ চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিল,—কেহ দেখিল না, কেহ শুনিল না, সেই নির্জ্জন প্রান্তরে বসিয়া সে শিশুর মত হু হু করিয়া কাঁদিল। তাহার শৈশবের কথা মনে হইল; তাহারই বাপের বাড়ী দুই ঈদের চারি দিনে কি আনন্দের স্রোতই না প্রবাহিত হইত! পাড়ার লোকের দাওয়াত হইত, কত গরীব দুঃখী ছোট বড় ছেলে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইত! দুঃখে, অভিমানে, ধিক্কারে তাহার বুকের তলটা জ্বলিয়া উঠিল, মাথা খাড়া রাখিবার শক্তি তিরোহিত হইল; গাছের শিকড়ের উপর মাথা রাখিয়া সে শুইয়া পড়িল, তাহার চোখের পানিতে বুক ভিজিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় থাকিতে থাকিতে ক্লান্ত হইয়া কতক্ষণ মধ্যেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। যখন সে জাগিল, দেখিল, পশ্চিমে বেলা লাল হইয়াছে; কিন্তু তাহার গায় প্রবল জ্বর—প্রায় সাত মাস পরে আজ গোয়ালপাড়ার নিদারুণ জ্বর ফিরিয়া আসিয়াছে!

আজ তিন দিন সিরাজের জ্বর—এর মধ্যে একটু বিরাম নাই; সে প্রলাপ বকিতে শুরু করিয়াছে। গ্রামের কবিরাজ আসিয়া ঔষধ দিয়া গেল; সিরাজের মামাত ভাই, প্রতিবেশী গফুর আসিয়া রাত বারটা পর্য্যন্ত সেবা শুশ্রূষা করিল; বারটার পর প্রলাপ কমিয়া আসিল, একটার সময় সে ঘুমাইয়া পড়িল। গফুর তখন রহিমাকে সাহস দিয়া ও নিজ স্ত্রীকে রাখিয়া বাড়ী গেল। কিন্তু শেষ রাত্রিতে আবার জ্বর প্রবল হইল, প্রলাপও আগের চেয়ে বেশী মাত্রায় আরম্ভ হইল; রহিমা শঙ্কিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সিরাজ কেবল ঘন ঘন পাশ ফিরিতেছিল ও বকিয়া যাইতেছিল। রহিমার উচ্চ চীৎকারে হালিমা জাগিয়া উঠিল এবং মাকে কাঁদিতে দেখিয়া নিজেও কান্না শুরু করিয়া দিল। হালিমার কান্না শুনিয়া সিরাজ চমকিয়া উঠিল ও শান্ত ভাব ধারণ করিয়া, অতি মধুর, অতি স্নেহমাখা স্বরে কহিল, "হালিমা, তুই কাঁদিস না, মা, তুই এবার না গেলি, থাক, আমি একাই যাচ্ছি। তুমিও কাঁদছ, রহিমা?"

রহিমা চক্ষু মুছিতে মুছিতে কহিল, "না, আমি আর কাঁদব, না; কিন্তু তুমি চুপ কর, দেখনা, হালিমা কাঁদছে? তুমি কোথায় যাচ্ছ ব'লে একি বকাবকি করছ?"

সিরাজ অতি প্রশান্তভাবে উত্তর করিল, "কোথায় যাচ্ছি?—কেন, নূতন বাড়ী!"

ইহজীবনে সিরাজের সেই শেষ কথা।

বৈশাখ, ১৩২৬

ভাই

(১)

দেশ বড় গরম; ধর পাকড়ের ধুম। গান্ধীরাজার আদেশে সকলে বিলাতি জিনিস ছাড়িয়া দেশী জিনিস ব্যবহার শুরু করিয়াছে। ঘরে ঘরে চরখা ঘুরাইবার উৎসাহ দেখা যাইতেছে, স্কুল মাদ্রাসার ছেলেদের মুখ হইতে কাড়িয়া রাখাল ছোকরারা 'আল্লাহু আকবর,' 'বন্দেমাতরম' গাহিয়া পল্লীপ্রান্তর মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। এই সার্ব্বজনীন উৎসাহের মধ্যে শুধু দুই এক স্থলে মেয়ে মহলে কিছু অসন্তোষের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। চরখার আবির্ভাব, খদ্দরের আমদানী প্রভৃতিকে মেয়েরা সকলে অকুণ্ঠিত চিত্তে বরণ করিয়া লইতে পারে নাই। পক্ষাধিক কাল কর্কচ লবণ ব্যবহারের পরই কোন কোন মেয়ে মহলে এমন কথাবার্ত্তার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে,—"ও বুজি, ঢেকিতে কি ভাঙ্গছ?" "বল ত কি?" "দেশী নুন?" "দেশী নুন, না গান্ধীর মাথা"—ইতি দন্ত কিড়িমিড়ি ও সজোরে পদাঘাত!

মমিনপুরে আজ 'স্বদেশী সভা'। মমিনপুরের সৈয়দ সাহেব আজ সভায় বক্তৃতা করিবেন। সৈয়দ সাহেবের পুত্র কলিকাতায় কোন কলেজে পড়িত। খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় তাহাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। যে সৈয়দ সাহেবকে সাধ্যসাধনা করিয়াও দেখা পাওয়া দুষ্কর, আজ সেই পুত্র শোকাতুর জমিদার সাহেব সভায় কি বলেন, তাহা শুনিতে দলে দলে লোক সভায় আসিয়াছে।

সভা বসিল, বক্তৃতা আরম্ভ হইল। প্রথমে হাটবাড়ীর উকিল সতীশ বাবু উঠিলেন। তিনি জ্বলন্ত ভাষায় কখনও উত্তেজিত, কখনও গম্ভীর, কখনও বা করুণার্দ্র স্বরে বহুক্ষণ বক্তৃতা করিয়া পরিশেষে কহিলেন, "ভাই কৃষকগণ, আদালতের উকিলরূপে বহুদিন তোমাদের রক্ত শোষণ করেছি, আজ তাই প্রায়শ্চিত্ত করতে তোমাদের নিকট এসেছি ; প্রতিজ্ঞা করেছি, আর ও পাপ আদালতের দুয়ারে পা দিব না। ভাই কৃষকগণ, তোমরাও আজ ভগবানের নামে প্রতিজ্ঞা কর, আর কখ্‌খনো আদালত ফৌজদারীতে যাবে না, বিদেশী ব্যবহার করবে না, পাট বুনবে না।" দুঃখ জ্ঞাপক "আহা" "উহু" ; উত্তেজনা, উৎসাহ, করতালি, "আল্লাহু আকবর", "বন্দেমাতরম্" প্রভৃতি ধ্বনিতে সভাস্থল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাহার পর সৈয়দ সাহেব উঠিলেন। শ্রোতৃবর্গ উৎসাহে হুঙ্কার দিয়া উঠিল। তিনি ধীর, গম্ভীর, শোকোদ্দীপ্ত, সতেজ কণ্ঠে সংক্ষেপে কহিলেন, "ভাই হিন্দু মুছলমান, আপনারা সব কথা শুনলেন, এখন এই অত্যাচার অবিচারের প্রতিকার করুন, জেলের জন্য প্রস্তুত হউন। আমরা স্বরাজ ও খেলাফত উদ্ধার করবই এবং জালিয়ান ওয়ালাবাগে যেমন হিন্দু মুছলমান, জমিদার প্রজা, ধনী গরিব একসঙ্গে গলাগলি ক'রে মরেছে, আমরাও আজ সর্ব্বপ্রকার ভেদ ভুলে একত্র কাজ করব, একত্র জেলে যাব। আপনারা সতীশ বাবুর কথামত কাজ করুন, চরখা ধরুন, আর এই স্কুল মাদ্রাসা নামীয় সরকারী গোলামখানা থেকে আপনাদের ছেলেগুলিকে বের করে আনুন।" সৈয়দ সাহেবের অপূর্ব্ব সুন্দর চেহারা! সেই সুন্দর অঙ্গের উপর ফকিরের সাজ—নগ্নপদ, মস্তকে আধ আনা দামের একটি গান্ধী টুপী, গায়ে একটি মোটা খদ্দরের সাধারণ কোর্ত্তা, পরণে খদ্দরের তহবন্দ; তাঁহার শোকার্ত্তস্বর, সব মিলিয়া দর্শকগণকে আকুল

করিয়া তুলিল,—সকলে কাঁদিয়া উঠিল। তিনি একটু থামিয়া আবার কহিলেন, "কৃষক ভাইরা আমার, আমি ত আজ তোমাদেরই দশজনের একজন। একমাত্র ছেলে জেলে আছে, বেশ থাকুক। আমিও জেলের জন্য প্রস্তুত। জমিদারীর জন্য পরোয়া নাই। ইচ্ছা হয় সরকার বাজেয়াপ্ত করে নিক। আমার আজ লক্ষ টাকার আয়, তাতেও যেমন চলছে, কাল যদি তোমাদের সঙ্গে গতর খাটিয়ে ত্রিশ টাকা রোজগার করি, তাতেও তেমনি চল্‌বে। এখন তোমরা কে কে কাজ করতে প্রস্তুত আছ, জান্‌তে চাই।"

এবার সভায় মৃদু ধ্বনি উঠিল ; এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে সভাস্থ একজন শ্রোতা দাঁড়াইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল, "আমি প্রস্তুত আছি, হুজুর যা বলেন, তাই করতে রাজি আছি, আমার ছেলে স্কুলে পড়ে, কালই তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেব।" সভায় "ধন্য", "ধন্য" রব পড়িল, হাত তালিতে সভাস্থল শব্দিত হইল। সৈয়দ সাহেব হাস্যপ্রদীপ্ত মুখে কলমটি লিখিবার ভঙ্গিতে সম্মুখস্থ কাগজের উপর ধরিয়া তাহার দিকে হেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নামটি কি ভাই ?" সে উত্তর করিল, "আমার নাম ফরিদ সরকার", আমি হুজুরেরই প্রজা ; আমার বাড়ী এই ফতেগঞ্জে।" সৈয়দ সাহেব কহিলেন, "বেশ, বেশ, তুমি বাহাদুর লোক।" তখন একে একে, দশে দশে, শতে শতে, লোক দাঁড়াইয়া সভার আদেশমত কাজ করতে স্বীকার করিল। অতঃপর মহা উৎসাহের মধ্যে সভা ভঙ্গ হইল।

(২)

পরদিন সকালে বেলা প্রায় এক প্রহর কালে ফরিদ সরকার তাহার ঘরে বসিয়া পান্তা ভাত খাইতেছিল, স্ত্রী আয়শা কাছে বসিয়া পিঁয়াজের খোসা ছাড়াইয়া দিতেছিল। খাইতে খাইতে ফরিদ কহিল, "আহ্, এই সময়টায় পান্তা এত চমৎকার যে গরম ভাত এর কাছে হার মানে; অথচ বছির এর ধারেই আস্‌তে চায় না। পান্তা খেলে নাকি মাথা খারাপ হয়।" আয়শা আর একটা পিঁয়াজের খোসা ছাড়াইয়া দিতে দিতে কহিল, "শুনেছ, ও পাড়ার ওমেদালী সেখের ছেলের বিয়ের জন্য কাল মেহ্‌মান এসেছিল।" ফরিদ একটা কাঁচা মরিচের আগায় কামড় দিয়া ছিঁড়িয়া ভাতের সঙ্গে চিবাইতে চিবাইতে কহিল, "হাঁ, শুনেছি—আঃ এই মরিচগুলা এত ছোট অথচ এত ঝাল যে দুইটা মরিচ হলেই এক থালা ভাত খাওয়া যায়।" আয়শা আবার কহিল, "আর সে বিয়ে নাকি ঠিকও হয়েছে।"

ফরিদ—"হাঁ তা ঠিক হওয়ার কথাই, দুইদিন পর্য্যন্ত যখন মেহ্‌মানরা ধুমধাম ক'রে খেয়ে গেল।"

আয়শা—"আমার বছিরও ত দুশমনের চক্ষে ছাই দিয়ে এখন বড় হয়ে উঠল, ওর চেয়ে কত ছোট ছোট ছেলে এ গাঁয়েই বিয়ে করেছে।"

ফরিদ—"আমি ভেবেছিলাম, ওকে আর একটু লেখাপড়া শিখাব; কিন্তু তা আর হয় না; সবাই স্কুল থেকে ছেলে বের ক'রে আন্‌ছে—ওখানে গেলে নাকি ছেলেগুলি খারাপ হয়; আমিও সৈয়দ সাহেবের কাছে কাল সভায় ব'লে এসেছি, ওকে স্কুল ছাড়া করব।"

আয়শা—"তা এখন স্কুলে পড়ালে ছেলেগুলো খারাপ হয়, কি না হয়, তা তোমরা পুরুষ মানুষ তোমরাই কেবল বোঝ। আর খারাপ না

হলেই বা কি ? আর এক বছর পড়ালেই ত এখানকার পণ্ডিতদের নাকি সমান বিদ্যা ওর হবে, আর তারা ওকে পড়াতে পারবে না। আমার একটা বই দশটা ছেলে নয় যে ওকে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়ে পড়াব। আর আল্লার মরজি, ওর বিদ্যাই বা কম কি হয়েছে ? ওর মত বিদ্বান ছেলে এই দুই চার দশ গাঁয়ের মধ্যে কয়জন আছে ? পাড়ার জানানারা কোন সময় বেড়াতে এলে হাঁ করে দাঁড়িয়ে ওর ইংরেজী পড়া শোনে। ফকিরণী বেটীরা ভিক্ষা নিয়েও ওর পড়া শুনতে চেয়ে থাকে ; মাগীদের বদ নজরে কবে বাছার আমার না জানি কোন্ নোক্‌ছান হয়, আমি সেই চিন্তায় ভয়ে ভয়ে থাকি। তা ওর পড়াশুনা হোক বা না হোক সে চিন্তা তুমি করগে ; আমি ওর সত্বরেই বিয়ে দিতে চাই—তুমি ওর জন্য একটি মেয়ে খোঁজ কর।" আয়শা আঁচলে আনন্দের অশ্রু মুছিল।

এমন সময় বাহির বাড়ী হইতে কে ডাকিল, "ভাই বাড়ী আছ নাকি, অ ফরিদ ভাই।" ফরিদের ভাত খাওয়া শেষ হয় নাই ; সে আধ-চিবানো ভাতগুলো গালের এক পাশে জমা করিয়া ভার গলায় উত্তর করিল, "কে ডাক ?" আগন্তুক উত্তর করিল, "আমি কানাই সরকার—ভাই ভাত খাচ্ছ নাকি, মুখ যে বড় ভারি লাগে ?" ফরিদ তাড়াতাড়ি মুখের ভাতগুলি গলাধঃকরণ করিয়া ডাকিল—"বছির—বছির।" বছির তখন অন্য ঘরে হেলিয়া দুলিয়া একতানে পুনঃ পুনঃ পড়িতেছিল, "একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে !" ফরিদ তৃতীয়বার ডাকিয়া কহিল, "ওরে, সরকার মশাই এসেছেন—একটা টুল নিয়ে দে। হাঁ কানাইদা, চারটা পান্তা ভাত খেয়ে নিচ্ছি ; তুমি বস, আমি এখনই খেয়ে আসছি।" কানাই কহিল, "আচ্ছা খাও, খাও। আরে পান্তা এমন মন্দই বা কি ? আমরা ত আদর করে ওকে বলি শীতলপ্রসাদ—আর তুমি ত ভাই

এখনই চারটা খাচ্ছ, আমার কপালে ত দুপুরের আগে কিছুই জোটে না। এই ত সেই ভোরে বের হয়েছিলাম, বাড়ী ফিরলাম এই ভেবে যে কিছু জলটল খাব ; এর মধ্যে শুনলাম যে ওমেদালীর ছেলের নাকি বিয়ে। সে সেই সম্বন্ধে কি পরামর্শের জন্য আমার কাছে গিয়ে আমাকে না পেয়ে ফিরে এসেছে। হুক্কায় একটা টান দিয়ে অমনি উঠলাম, দেখি, ওমেদালীর খবরটা একটু নিয়েই আসি, জলটল না হয় পরেই খাব। কোন বিপদ না হলে ত আর সে আমার কাছে যায় নাই। ভগবান দশটা টাকা আমায় নাড়াচাড়া করতে দিয়েছেন, তা যদি অসময়ে প্রতিবেশীর কাজে না লাগল, তবে আর ওতে লাভ কি ?" এই বলিয়া কানাই সরকার, "মা দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা" বলিয়া আঙ্গুলে তিনটা তুড়ি দিল।

ইতিমধ্যে বছির টুল আনিয়া দিলে কানাই সরকার মৌ-আটা গাছের ত্রিভঙ্গ আকৃতি লাঠিটা একদিকে রাখিয়া বসিল। ফরিদ সরকারও খাওয়া শেষ করিয়া হুক্কাটি হাতে লইয়া বাহিরে আসিয়া কহিল,—"তারপর কানাইদা, কি কথা মনে ক'রে ? তুমি যে আমার বাড়ী মাড়াবে, এ ত আমি কখনো ভাবি নাই।" কানাই তাহার রৌদ্র-দগ্ধ শুষ্ক মুখখানি প্রসন্ন হাসিতে ভরিয়া উত্তর দিল,—"আরে রাম, রাম, সে আবার কি; কিছু মনে ক'রে আসতে হবে ? সেই তোমার বাপ থাকতে যখন তুমি আমি দু'জনায় হরি ঘোষের পাঠশালায় একত্র পড়তাম, তখন যে তোমার মায়ের হাতের কত মুড়ী মুড়কী, আম জাম খেয়েছি তা কি ভুলব ? এতই অকৃতজ্ঞ আমায় মনে কর তুমি ? তবে মধ্যের কয়টা দিন আমি তোমার বাড়ী আসি নাই, কি তুমিও আমার বাড়ী যাও নাই, সে আমারও দোষ নয়, তোমারও দোষ নয়। কতকগুলি কুলোক মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের মনোমালিন্য ঘটিয়ে দিয়েছিল।

ভগবানের আশীর্ব্বাদে তুমি পঞ্চায়েতী করে বেশ দু'পয়সা রোজগার কর ; ছেলেটাকে লেখাপড়া শিখাচ্ছ ; মা দুর্গার কল্যাণে আমিও দু'টা মোটা ভাত মোটা কাপড় পাচ্ছি ; অপরের সুখ, উন্নতি ত আর বদলোকের সয় না। তাই তারা আমাদের দু'জনার মধ্যে বেশ একটু মন কষাকষি সৃষ্টি ক'রে দিয়ে তফাতে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখতে লাগল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় যে দিন এসেছে, তাতে আর দুষ্ট লোকের কারসাজী টিকছে না। দেখলে ত কালকের সভায়, হিন্দুমুছলমান, ধনী গরিব, রাজা প্রজা সব ভাই ভাই, এক ঠাঁই। আজ ওই ওমেদালীর বাড়ী যাচ্ছিলাম, মনে করলাম দু'খানা বাড়ী ঘুরে একটু জিজ্ঞাসা করে যাই, ফরিদ ভাই কেমন আছে। হরি হে, তুমিই জান" বলিয়া কানাই চুপ করিয়া একটু গম্ভীর ভাব ধারণ করিল।

কানাইয়ের কথা শুনিয়া ফরিদ খুব খুশী হইল। অনেকদিন আগে তাহারা দুইজন একত্র পাঠশালায় পড়িত ; পাঠশালা হইতে উভয়েই 'সরকার' হইয়া বাহির হইল। ফরিদের দশ "পাখী" জমি ছিল, সে একজন ভৃত্যের সাহায্যে একখানা হাল চালাইয়া, পঞ্চায়েতী করিয়া ও দশজনের তমস্থক, মেয়াদী-পাট্টা, রেহানী দলিল ইত্যাদি লিখিয়া দিন গুজরান করিতে লাগল। কানাইয়ের জমিজমা কিছু ছিল না, সে স্থানীয় হাটখোলার মাড়োয়ারীর কাপড়ের দোকানে গোমস্তা হইল। চারি বৎসর চাকুরীর পরই কানাই দোকান ছাড়িল। তাহার শত্রুরা কহিত, "মাড়োয়ারী কানাইকে বরখাস্ত করিয়াছে।" মাড়োয়ারী নিজে এ সম্বন্ধে চুপচাপ থাকিত। কানাই কহিত, "পরের গোলামী আর পোষায় না, তাই ছেড়ে দিলাম।" কানাই বাড়ী আসিয়াই সুদী কারবার শুরু করিল ; চৈত্র বৈশাখে টাকা প্রতি মাসিক ছয় পয়সা হইতে দশ পয়সা

সুদে টাকা ছড়াইতে লাগিল। খাতকও জুটিতে লাগিল। কানাই এখন চক্রবৃদ্ধি সুদ ও রেহান দলীল ছাড়া টাকা কর্জ্জ দেয় না। কানাই সরকার বড় উচিত লোক ; সে টাকা দেওয়ার সময় যেমন একশত টাকা কর্জ্জ দিলে একশ টাকাই খাতককে কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দেয়, খাতকের নিকট হইতে টাকা আদায়ের সময়ও তেমনই উচিতমত প্রাপ্য টাকা সুদে আসলে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লয়। অনেক দুঃখী খাতক টাকা শোধ করিতে পারে না ; অনেকে শুধু টাকা নিতে মজবুত, দেওয়ার কথা মুখেও আনে না। সুতরাং রেহানী দলিলের মারফতে কানাইয়ের জমি বাড়িতে লাগিল। পাঁচ বৎসরের মধ্যে সে আড়াই শত "পাখী" জমির মালিক হইল। ওদিকে ফরিদের সহিত তাহার পূর্ব্ব বন্ধুত্ব লোপ পাইল। ফরিদকে তাহার গ্রামের লোকে মানিত, গণিত। সে সাধ্য-পক্ষে তাহার গ্রামের লোককে টাকা কর্জ্জ করিতে দিত না ; বিশেষতঃ কানাই সরকারের টাকা। ফলে কানাই বিরক্ত হইল এবং ফরিদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বন্ধ রহিল।

এতদিন পর কানাইয়ের মুখে অন্তরঙ্গের মত কথা শুনিয়া ফরিদের সেই সুখের শৈশবের কথা মনে পড়িল। সে আনন্দিত হইয়া কহিল, "যাক কানাইদা, যা হয়ে গেছে, তা গেছে ; ও উঠিয়ে আর দরকার নাই।"

কানাই কহিল, "ছেলেকে ত লেখাপড়া শিখিয়ে লায়েক ক'রে তুল্‌লে, এখন ওর একটা বিয়ে থাওয়ার জোগাড় কর, তোমার একটিমাত্র ছেলে বই ত নয়!"

ফরিদ—"হাঁ, তোমার আসার ঠিক আগেই বছিরের মাও ঐ কথাই বল্‌ছিল। তবে এই টানাটানির সময়, টাকা পয়সার একটু অযোগাড়,

পঞ্চায়েতীর ফিস্ একশ টাকা, আর পাট বেচা চল্লিশ টাকা আছে; কিন্তু এতেও হয় না; তাছাড়া এবার ক্ষেতে পাটও বেশী বুনলাম না, আগামী বছরের খাই খাজনা, কাপড় চোপড় আছে।"

কানাই—"হাঁ, পাট বেশী বোন নাই সে ভালই করেছ। পাটেই ত দেশ গেল, এই দেখ, গত বারে কেনা পাঁচশ মণ পাট আমার গুদামেই পচছে। কোথায় দু'পয়সা লাভ হবে, না—ও আমার পাঁজরের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসল টাকাটা ঘরে তুলে আমি এখন মানে মানে ছাড়তে পারলে বাঁচি। তাই ত আমিও এবার যেখানেই যাই, ঐ কথা সকলকেই বলি, 'ভাই পাট কম বোন, পাট কম বোন!"

ফরিদ—"তোমার জমিগুলিতে বুঝি এবার পাট বুন্‌বেই না তা হ'লে?"

কানাই—"হাঁ, তাই ভেবেছিলাম; তবে জান কি, আমরা কায়েত মানুষ, নিজের আধ পয়সার মুরোদ নেই, জমি জমার জন্য ঐ চাষার উপরেই ষোল আনা নির্ভর করতে হয়। তাতে জমিতে পাট বুনলে তবু দু'পয়সা ঘরে আসে, ধান বুনলে আর রক্ষা নাই। বর্গাদারের বাড়ীর হাঁস মুর্গীতে খায় অর্দ্ধেক, মেয়েরা অবশিষ্টের আর অর্দ্ধেক দিয়ে মাছ, পাতিল, চুড়ি তাবিজ কেনে। ক্ষেত হতেই যে নিজের বাড়ীতে ধানের আটী এনে তুলব, তা আমার লোকজন কৈ যে ধান মলন দিয়ে, উড়িয়ে, শুকিয়ে ঘরে তুলবে? সে যাক, ঐযে ছেলের বিয়ের কথা বলছিলে, আমি বলি, ভগবানের নাম নিয়ে বিয়ের একটা যোগাড ক'রে ফেল, টাকা পয়সার ঠেকাঠুকা হয়, আচ্ছা আমি দেখ্‌ব, এই তোমাকে বল্লাম। বিয়ের সওদাপাতি শ্রীভগবানের কৃপায়, তোমাদের দশজনের আশীর্ব্বাদে, আমার দোকানেই সব মিলবে, আর অন্যত্র খুঁজতে

যেয়ে হয়রাণ হ'তে হবে না। তা বেশ, এখন দাম না দিতে পার, সব বাকী থাকবে, সময় মত ফসল কেটে দিও। এও ত বললে হয় যে, ও দোকান আমারও যেমন, তোমারও তেমনই। আচ্ছা, এখন যাই, ফরিদ ভাই।"

কানাই উঠিয়া ওমেদালীর বাড়ীর দিকে চলিল, ফরিদ হুঁকাটা হাতে লইয়া তাহার ঘরে গেল।

আয়শা ঘর হইতে কান পাতিয়া এতক্ষণ সব কথাই শুনিতেছিল। এখন ফরিদ ঘরে ঢুকিতেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "এই যে গো, এখন ত সব হ'ল। যখনই ছেলের বিয়ের কথা কই, তখনই ঐ এক কথা—টাকা নাই, টাকা নাই, টাকা নাই! টাকা নাই তা কি কর্জ্জও পাওয়া যায় না? তখন আবার মুখটি ভার, কর্জ্জ করতেও নারাজ! বলি, খোদার মুল্লুকে ধার কর্জ্জ ছাড়া কয়জন মানুষ আছে দেখাতে পার? একটি মাত্র ছেলে, তা'কে বিয়ে দেবে না, টাকা নাই ব'লে— দুনিয়ার যত সৃষ্টি ছাড়া কথা! তা এখন ত হ'ল! এই ত বলতে বলতেই টাকার যোগাড় হ'ল। এখন সরকার মশাইয়ের কাছ থেকে টাকা হাওলাত নিয়ে বিয়েটা শেষ ক'রে ফেল।" ফরিদ সংক্ষেপে উত্তর করিল, "হুঁ"। আয়শা আবার পরম উৎসাহের সঙ্গে কহিতে লাগিল, "বিয়ে কিন্তু এই মাসেই হওয়া চাই।"

ফরিদ কহিল, "আচ্ছা।"

আয়শা—"একটু ভাল ঘর দেখে বিয়ে দিতে হবে; ছেলে কিন্তু আমার পড়াশুনা জানা। তা সে ভাল ঘরে গেলে টাকা পয়সা কিছু বেশী লাগে লাগুক, টাকা ত খোদা জুটিয়েই দিলেন।"

ফরিদ—"আচ্ছা, দেখা যাবে।"

আয়শা—"আর এ বিয়েতে কিন্তু আমার বোন দুইটিকে আনতে হবে—তাদের সঙ্গে ছেলেমেয়েও অনেকটি—তা বলেই বা কি করা যায়। আমার একটা বই ত দশটা ছেলে নয়, ওর বিয়ে দেখতে যদি ওর খালারা না আসে, তা হ'লে আর জাত থাকে কোথায়? মা বুড়া মানুষ, কবে মরে যায়, কে জানে? নাতীর বিয়ে দেখবে এ তার চিরদিনের সখ। আবার ওর মামীরই বা কি করা যায়? যতবার সেখানে গিয়েছি তত বারই সে কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান ক'রেছে,—বুবু, তোমার ছেলের বিয়ের সময় আমাকে নিয়ে যেও।"

ফরিদ—"আচ্ছা ওসব দেখব।"

আয়শা—"তা সবকে দেখতে হবে বই কি? বছিরের ফুফুরা তিনজন আছে, তাদেরকেও কি বাদ দেওয়া যাবে? থাকুক না তাদের সাথে ছেলেপুলে কয়েকটা ক'বে; ছেলেপুলের ভয়ে কে কবে ভায়ের বাড়ী, ভাইপোর বিয়েয় না যায়? এই ত হ'ল। আর ও পাড়ার ফেতুর মা তার ছেলের বিয়েতে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল, তাকে একটু না আনলে সে বড় নিশ্বাস ফেলবে। তার জন্য ত আর ডুলী ভাড়া লাগবে না; জোছনা রাত, এ পাড়া ও পাড়া, বছিরকে পাঠালে তার সঙ্গে হেঁটেই আসতে পারবে। গ্রামের আর আর মেয়েরা চেয়ে আছে, বছিরের বিয়ে দেখবে, তা তাদেরকে দাওয়াত ক'রে এক বেলার বেশী খাওয়ান যাবে না; বাড়া-কোটা, মাজা ঘসার জন্য কেতুর মা ও পাঁচীর চাচীকে বাড়ীতে বিয়ের কয়টা দিন রাখলেই চলবে; ব্যাঙার বোন গরীব মানুষ, ভিখশিখ ক'রে খায়, সে না ছাড়ে, কয়দিন থাকলেই বা!"

ফরিদ—"তুমি যে বিয়ের খাওয়া দাওয়া এখনই শেষ ক'রে ফেলে।"

আয়শা—"শেষ করা কি, কথাগুলো মনে এল, তাই বলে রাখলাম। এইত ছাই, ভুলে গিয়েছিলাম একটা কথা, দারগ আলী মণ্ডলের ছেলের বিয়েতে তারা লাঠিয়াল এনেছিল; বছিরের বিয়েতেও কিন্তু লাঠিয়াল আনতে হবে। অন্য ধনী লোক পঁচিশজন আনে, তুমি পাঁচজন আন—আমার একটি ছাড়া ত দশটি ছেলে নাই? আর সে ছেলেও আমার মুরুখ্খু শুরুখ্খু নয়। বিয়ে ঠিক হ'লেই বৌয়ের হাতের পায়ের মাপ নিয়ে গয়নার ফরমাস দিতে হবে। আমাদের কালে এত গয়নার ধূম ছিল না। এখন কত রকম বেরকমের গয়নার কথা শুনি। তা যখন কালই এমন পড়েছে, ছেলেকেও একটু ভাল ঘরেই বিয়ে দিতে হবে, তাতে দু'দশ টাকা বেশী লাগে লাগবে; তবু পাড়ার বৌঝিরা, নায়রী মেয়েরা যেন বৌ দেখে খুশী হয়।"

ফরিদ স্ত্রীর কথায় সম্মতি জানাইল। কারণ সে জানিত, আর সব কথায় আয়শাকে থামান যায়, শুধু ছেলের কথায় কোন আব্দার শুরু করিলে সে একদম নাছোড় বান্দা—তাহার জেদ সে বজায় রাখিবেই।

আয়শা তখন আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া ছেলের খাওয়ার খোঁজে উঠিল। ছেলের খাওয়ার কথা মনে করিতেই তাহার মাতৃ-হৃদয় স্নেহ ও করুণায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল! সে ভাবিল "আহা, এত বেলা হয়েছে, আর আমি বছিরের জন্য গরম ভাত রান্নার কথা ভুলে গিয়ে এতক্ষণ কেবল গল্পই করছি!" পাকের ঘরে যাওয়ার আগে সে বছিরের ঘরের দিকে চলিল; ইচ্ছা, একবার দেখিয়া যায়, বছির এতক্ষণ চুপচাপ কি করিতেছে। বছির সরকার মশাইকে বসিতে দিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সরকার মশাই ও তাহার পিতার মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাহা শুনিতেছিল। যখন সে তাহার পিতার মুখে শুনিল যে, আর তাহাকে স্কুলে যাইতে হইবে না,

তখন সে এক দৌড়ে পড়ার ঘরে আসিয়া বিছানার উপর হইতে পাঠ্য বইগুলি আধ গোছান ভাবে একত্র করিয়া নিকটস্থিত কেরোসিনের বাক্সে ফেলিয়া রাখিল এবং সিকার উপর কাঁথার ভাঁজ হইতে "সচিত্র আরব্য উপন্যাস" খানা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। আয়শা যখন ঘরে আসিল, তখনও সে একান্ত মনে নীরবে সেই বই পড়িতেছে। এত বেলাতেও পুত্রকে চুপটি করিয়া নীরবে পাঠে নিরত দেখিয়া আয়শার হৃদয়ের স্নেহ আরও উছলিয়া উঠিল। সে কাছে যাইয়া বছিরের কাঁধে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, ''যা বাবা, এখন গোছল ক'রে আয়, আমি ভাত রাঁধতে চল্লাম, তুই ফিরে আসতে আসতেই ভাত হ'য়ে যাবে।" তাহার পর বছিরের সম্মুখে খোলা বইয়ের একটা ছবি দেখিয়া কহিল, ''ওটা কিরে বছির?" বছির মাথা তুলিয়া কহিল, "ওটা সিন্দবাদের ঘাড়ের উপর ভূত।" ভূতের কথায় মাতা স্নেহ-স্নিগ্ধ মৃদুহাস্যে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "ঘাড়ে ভূত চাপল, তারপর কি হ'লরে পাগল?" বছির বইখানা সিকার উপর রাখিতে রাখিতে কহিল, ''এই কেবল ভূত চাপল, মা, এর পর কি হবে পরে জানা যাবে।" বছির কাপড় কাঁধে পুকুরের দিকে চলিল, মা রান্নাঘরে ঢুকিল।

হোছেনপুরের আমীর উদ্দিন তালুকদারের মেয়ে কছিম উন্নেছার সঙ্গে বছির উদ্দিন আহ্‌মদের বিবাহ মহা ধুমধামে হইয়া গেল। মহা ধুমধামে, কেন না ফরিদ সরকারের পক্ষে তাহা মহা ধুমধামই বটে। আয়শা যে খরচের বরাদ্দ করিয়াছিল খরচ তাহা অপেক্ষাও বেশী হইল। কেবল রক্ষা যে কানাই সরকার অযাচিতভাবে দোকান হইতে জিনিস, তহবিল হইতে টাকা, যখন যাহা দরকার তাহা দিয়া ফরিদের এ শুভ কাজ আঞ্জাম করিয়া দিল। ফরিদকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না; কোন লজ্জাতেও

পড়িতে হইল না। আয়শা লালটুকটুকে ছোট্ট বৌটিকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়া আরামের নিশ্বাস ফেলিল। কেবল গ্রামের দুই একজন হিংসুক লোক বেজার হইল। তাহারা ঘোরাঘুরি করিয়া কানাইয়ের কাছে টাকা পায় নাই; আর ফরিদ অনায়াসে না চাহিয়া সব পাইল। ফরিদ ও কানাইয়ের মাখামাখিতে তাহাদের ঈর্ষা হইল।

বিবাহের মাস দুই পর কানাই একদিন ফরিদকে কহিল, "ফরিদ ভাই, আমার শরীরটা ইদানিং বড় ভাল নয়। বিয়ের মধ্যে যে কয়টা টাকা দিয়েছি, এক টুকরা কাগজে তা একটু লিখে রাখলে ভাল হয়। এর মধ্যে যেদিন পার, একবার যেয়ো, গোলমালটা মিটিয়ে ফেলা যাবে।" তারিখ করিয়া এর দুইদিন পর ফরিদ কানাইয়ের বাড়ী গেল। কানাই বেশ সমাদরে তাহাকে বসাইয়া পান তামাক দিল, মুড়ী মুড়কী দিয়া একটু জল খাইতে অনুরোধ করিল, এবং পুত্র শরৎকে কহিল, "বাবা, ফরিদ ভাইয়ের টাকা-টার একটা হিসাব ধরত।" শরৎ খাতা দেখিয়া তারিখ মিলাইয়া ফরিদকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত অঙ্কপাত করিল এবং যোগ দিয়া দেখাইল, কানাইয়ের নিকট ফরিদের তিনশ' টাকা হাওলাত। ফরিদ একটু হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কানাইদা, এত টাকার এখন কি হবে?"

কানাই নিতান্ত সহজ সুরে কহিল,—"হবে আর কি, এ সময় কি তুমি চুরি করে টাকা শোধ করবে? টাকা আছে থাকুক, সময় মত শোধ করবে; এখন একটু কাগজে লিখে দাও, কাগজটা বাক্সে ফেলে রাখি। লেখত বাবা শরৎ; না, না হয়, ও বাড়ীর কালু সরকারকে ডাক দিয়ে তার দ্বারা একটা কাগজ লিখে ফেল।"

শরৎ কালুকে ডাকিয়া আনিয়া কাগজ লিখিতে দিল। ফরিদ কাপড়ের আঁচলে মুড়ী লইয়া চিবাইতে চিবাইতে কানাইয়ের সহিত

আলাপ করিতেছিল। ইতিমধ্যে শরৎ জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, সুদ কত লিখ্‌বে?" কানাই চমকিত হইয়া শরতের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "সুদ আবার কিরে? ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখতে শুরু করেছ বুঝি? বোকার দল, একটা ফাস কাগজে লিখে দিলেই ত হ'ত। তা যখন ষ্ট্যাম্পে খানিকটা লিখে ফেলেছ, তখন ওটা নষ্ট ক'রে কি হবে? লেখ একটা কিছু সুদ।" এই বলিয়া কানাই ফরিদের দিকে চাহিয়া কহিল, "দেশটা বিদেশীর হাতে গিয়ে যে কি ক্ষতিই হয়েছে; কাগজে সুদ না লিখ্‌লে ত সে কাগজের মূল্যই নাই! দেখলে না সেদিন, সতীশ বাবু সভায় এ কথাগুলি কি সুন্দর ক'রে বুঝালেন; বাস্তবিক ইংরেজেরা সুদ ছাড়া আর দুনিয়ায় কিছু বোঝে ব'লে মনে হয় না। বিলাত দেশটা নাকি কেবল সুদি কারবারের জোরেই এত বড় হয়েছে।"

কানাই আবার শরতের দিকে মুখ ফিরাইল। কালু তখনও তাহার উপদেশের প্রতীক্ষায় কলম উঠাইয়া বসিয়া রহিয়াছে। কানাই কহিল, "লেখ না, একটা কিছু, না লিখলে যখন নয়, তখন লেখ। অন্য লোককে এই বৈশাখ মাসের দিনে দশ পয়সা বার পয়সা দরে টাকা দেই, এ দলিলে আট পয়সা হারে লিখে রাখ।" এই বলিয়া সে ফরিদের দিকে ফিরিয়া কহিল, "দেনা পাওনার সময় যা হবার সেত হবেই, এখনকার মত এই লেখা থাক, এর চেয়ে কম সুদ লিখলে বাজার নষ্ট হয়।" ফরিদ সংক্ষেপে "আচ্ছা, তাই লিখুক" বলিয়া আবার ধীরে ধীরে মুড়ী চিবাইতে লাগিল। দলিল লেখা শেষ হইলে শরৎ তাহা ফরিদের হাতে দিল। ফরিদের তখন মুড়ী খাওয়া শেষ হইয়াছে; সে একটু জল খাইয়া কাগজ পড়িতে লাগিল। দেখিল, তাহাতে দুই আনা সুদের উপর আবার চক্রবৃদ্ধি লেখা আছে। সে কানাইকে তাহা আঙ্গুল দিয়া দেখাইল। কানাই কহিয়া উঠিল, "এই

ম্যাঃ, আবার চক্রবৃদ্ধি কেন? দশের দলিল লিখে লিখে হাত এমন খারাপ হয়েছে যে, ও শব্দটা বুঝি আপনিই এসে পড়ে। আচ্ছা দাও ভাই, তোমার দস্তখতটা দিয়ে দাও, তুমি আমি যতদিন আছি, ততদিন ও দলিলি চক্রবৃদ্ধিতে আমাদের কি আসে যাবে?" ফরিদ বিনা আপত্তিতে দলিলের নীচে দস্তখত করিয়া বাড়ী ফিরিল। ফরিদ চলিয়া গেলে শরৎ জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, এ দলিলের দামটা কোন ঘরে লিখ্‌ব? এমন দাম ত কখনও দেই নাই কিনা।" কানাইয়ের ছোট ছেলে তখন বড়শীর ছিপ কাঁধে মাছ ধরিতে চলিয়াছিল; সে কহিল, "বাবা আমি কিন্তু কাল বৈকালে দাদার কাছ থেকে আট আনা নিয়ে বড়শী, ছিপ এই সব কিনেছি।" কানাই শরৎকে কহিল, "আচ্ছা বেশ, আর কোন ঘরে ও ষ্ট্যাম্প খরচ না পড়ে, ঐ বড়শীর খরচের সঙ্গে দুইটা একত্রে বড়শী খরচ ব'লে লিখে রাখ।"

(৩)

সেদিন ফরিদ একটু গরম হইয়া বাড়ী ফিরিল। আয়শা জিজ্ঞাসা করিল, "এত দেরি হ'ল কেন, কি হ'ল?" ফরিদ ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, "ছেলের বাপের শ্রাদ্ধ হ'ল।"

আয়শা—"কেন, ব্যাপারটা কি?"

ফরিদ—"ব্যাপার আর কি, যা কোন দিন জীবনে করি নাই, যা কোনও দিন করব না ভেবেছিলাম, আজ তাই করতে হ'ল; কানাই সরকারের বাড়ী বিয়ের টাকার সুদি দলিল দিয়ে এলাম।"

আয়শা—"ওমা, সেকি কথা! হাওলাতি টাকার আবার সুদ হবে?"

ফরিদ—"আমি ত আর তোমার মত মেয়ে মানুষ নই যে ঘরে বসে

দুটো কড়া কথা বললেই সব চুকে যাবে। সে দলিল চাইলে, আমিও একটি কথা না বলে নাম দস্তখত করে দিলাম। তার উচিত টাকা, সে দলিল চাইলে আমার বলবার আর কি আছে ?”

আয়শা—“ওমা, কি কুক্ষণেই এ বিয়েটা হয়েছিল গো! আর এত আদর করে বৌ আনলাম, সেই বৌ যখন আমার বিগড়ে গেল, তখন আর অন্য কার দোষ দিব ? একরত্তি বৌ, পাতলা শরীর, দৌড়াদৌড়ি ক'রে সারাদিন কাজ করবে, ওমা সে বৌ কেবল কাঁদাকাটি করে, আর বলে কিনা, এ বাড়ীতে তার থাকতে ইচ্ছা হয় না। এই যে একমাস হয় বৌ বাপের বাড়ী গেছে, আর ত তাকে আনার নামটি মুখে কর না। আমি আর একলা কাজ কাম ক'রে পারি না। আবার বেহান নাকি বলে, তার মেয়ে আর শিগ্‌গীর পাঠাবে না। তুমি কালই ডুলী পাঠাও, যদি না পাঠায় তবে বেহানের মুখেও ঝাঁটা, ও বৌয়ের মুখেও ঝাঁটা! ওরে বছির, আর দেখ, তুই বৌ এনে বাড়ীতে রেখে বাড়ী হ'তে বের হয়ে রোজগার কর, বৌকে খাওয়া আর পরা। তারপর কিছু থাকে আমাদের দিস্ না থাকে না দিস্। এত দেনা মাথায় নিয়ে লায়েক ছেলেকে ঘরে বসিয়ে রাখা বড় সুখের কথা নয়।” বছিরের প্রাণে কথাগুলি সূঁচের মত বিঁধিল। বিয়ের পর হইতেই সে লক্ষ্য করিতেছিল তার মা বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে, আর ইঙ্গিতে তাহাকেও আঘাত করে।

বছির চাকুরীর খোঁজে বাহির হইল। চাকুরীর বাজারে একেবারে আগুন। মাসেক কাল ঘুরিয়াও সে কোন কাজ পাইল না। অবশেষে সে মমিনপুরের সৈয়দ সাহেবের কাছারীতে গিয়া ম্যানেজারকে ধরিল। ম্যানেজার বাবু নূতন আসিয়াছেন; বড় দয়ালু। বছিরের কথাবার্ত্তায়

তাঁহার ধারণা হইল, ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান। তাহার পারিবারিক অভাবের কথা শুনিয়া তাঁহার দয়া হইল; তিনি কহিলেন, "এক সপ্তাহ পরে তুমি ফের এস, দেখি তোমাকে আপাততঃ একটা কোন সেরেস্তায় শিক্ষানবীশরূপে নিতে পারি কিনা। বছির খুব খুশী হইয়া বাড়ী ফিরিল। কিন্তু সে ঘরের বাহির হইতে না হইতেই পেশকার শমশের খাঁ সাহেব ম্যানেজার বাবুকে কহিলেন, "বাবু আপনি ত নূতন এসেছেন, এখানকার চালচলন হয়ত সব জানেন না; এই যে ছোকরা দেখা করে গেল, এ এক গেরস্তের ছাওয়াল, তা তে আবার একটা সাধারণ প্রজা। এসব স্যাক ম্যাকের বেটা ভাইপোকে কাজে ঢুকালে আর আমরা আমলা ফয়লাদের মান ইজ্জত থাকে না।" জমা নবীশ শশীবাবু, সুমার নবীশ হেমন্ত সরকার, খাজাঞ্চী কাঞ্চী মিঞা, সকলেই খাঁ সাহেবের কথার সমর্থন করিলেন। সুতরাং সাত দিন পরে বছির আসিলে ম্যানেজার বাবুকে জবাব দিতে হইল, "কোন কাজের সুবিধা নাই।" আসল কারণ কিন্তু একটি পিয়াদার মারফত বছিরের কানে গেল। সে মনে করিল, এবার সে খোদ সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করিবে। নামের চিঠি ছাড়া খোদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করা যায় না। সে চিঠি দিল। সৈয়দ সাহেব বরকন্দাজের মারফত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন সে কি চায়। বছির চাকুরী চায় শুনিয়া তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, "তা হলে আর এখানে দেখা করার দরকার নাই; দরখাস্ত ম্যানেজারের হাতে দিয়ে যাক।"

এ সংবাদে বছিরের মা বড় ব্যথিত হইল। বছির কহিল, "মা, এত ভাবনা কেন? চাকুরী না মিলে, লাঙ্গল জোয়াল ত আছে। চাষ ক'রে খাব, স্বাধীন ভাবে থাকব, উঠতে বসতে কারো

সামনে হুজুর হুজুরও করতে হ'বে না, যখন তখন বকুনিও খেতে হবে না। আয়শা চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, "তুই কি হাল চাষের কাজ পারবি ? আর পারলেই তোকে আমি লাঙ্গল ধরতে দেখব কোন্ চোখে ?" বছির দৃঢ়স্বরে কহিল, "কেন পারব না মা, খুব পারব। এই একমাস চাকুরীর খোঁজে ঘুরে ঘুরে এখন বুঝতে পেরেছি, যে বাস্তবিক আমি চাষার বেটা, চাষ করেই আমাকে খেতে হবে, আর সেই-ই আমার পক্ষে মানের কাজ। লেখা পড়া শিখে লাঙ্গল ধরায় ত কোন দোষ নাই মা। এই লেখা পড়ার জোরে আমি সব চাষার সর্দ্দার হব, চাকুরী করতে গেলে ত আমি পড়ে থাকব সবের নীচে।"

একদিন ফরিদের হঠাৎ বিষম জ্বর হইল, এবার বুঝি সে আর ফেরে না। ফরিদ জীবনে হতাশ হইয়া কানাই সরকারকে ডাকাইয়া মাথার পাশে বসাইয়া কহিল, "দাদা আমি বোধ হয় চল্লাম; যদি তোমার কোনও অন্যায় করে থাকি, মাফ্ কর।

কানাই কহিল, "আরে হাত ছাড়, হাত ছাড়, পাগল হ'লে নাকি ? একটু জ্বর হয়েছে, ও ভাল হয়ে যাবে এখন। কোন চিন্তা নাই, ভগবানের নাম কর, সব রোগ চলে যাবে।"

ফরিদ বছিরকে কাছে ডাকিয়া তাহার পর কহিল, "যদি এবার না ফিরি, তবে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে যাব। বাবা বছির, তুমি তাড়াতাড়ি এ ঋণটা শোধ কোরো, মনে রেখো ঋণ রেখে মরার চেয়ে আফসোসের কথা মুসলমানের আর কিছুই নাই। কানাই দা, তুমি ওকে বাঁচিয়ে নিও, তোমারই হাতে ওকে রেখে গেলাম।"

কানাই কহিল, "ভগবান না করুন, যদি তোমার কিছু হয়, তবে কি আর আমায় বলতে হবে ?"

বছির কাঁদিতে লাগিল। ইহার পর স্ত্রী, বউ, বছির ও দুই বৎসরের মেয়ে ফতেমাকে রাখিয়া ফরিদ ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

ফরিদের তামদারীতে কিছু টাকা ব্যয় হইল; তাহা কানাই সরকার দিল এবং এ টাকা ও বিবাহের সময়কার দোকানের বাকী মোট দুইশ' টাকার পূর্ব্বোক্ত রূপ দলিল হইল।

(৪)

তিন বৎসর যায়। চৈত্র মাস; কানাই সরকারের দলিলের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিয়াছে। সে বছিরকে একদিন কহিল, "বাপু, দলিলের ত তামাদীর সময়, এখন ত আর দলিল ঘরে রাখা যায় না, আদালতে প্যাঠাতে হয়। অবিশ্যি তা পাঠান আমার ইচ্ছা নয়, তবে যা রীতি তাই বল্লাম। এখন এ টাকাগুলার একটা বিধি ব্যবস্থা কর। শরৎ সুদে আসলে টাকার পরিমাণটা হিসাব করে দিও ত।" শরৎ হিসাব করিয়া কহিল, "এ তিন বৎসর খাতক যা সুদ দিয়েছে তা ওয়াশীল দিয়ে এখন সুদে আসলে মোট চৌদ্দশ' টাকা বাকী।" বছিরের মাথায় বজ্রপাত হইল। সে গত তিন বৎসর ধরিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অনেকগুলি টাকা দিয়া আসিয়াছে। তাহার ভরসা ছিল, আর দুই এক বৎসরের মধ্যেই টাকাটা শোধ হইয়া যাইবে। কিন্তু সে এক পা অগ্রসর হইতেই যে সুদ ইতিমধ্যে চুপে চুপে পাঁচ পা অগ্রসর হইয়াছে, তাহা সে কখনো ভাবে নাই। সে নিতান্ত নিরাশা-কাতর স্বরে কহিল, "কাকা, এতটা দেই আমার সাধ্য কোথায়?

আর আপনি যদি আমাকে বাঁচিয়ে না নেন, তবে ত আর আমি বাঁচি না।"

কানাই কহিল, "আরে, সে কথা কি আমি কখনো অস্বীকার করেছি? চৌদ্দশ' টাকা হয়েছে ব'লেই কি আর তোমার কাছ হ'তে ঐ চৌদ্দশ' টাকাই নিচ্ছি? আর কেউ হ'লে অবশ্যি এক পয়সাও ছাড়তাম না—কারণ এত আর লুটপাটের, চুরি দাগাবাজীর টাকা নয়, এ দলিল মোতাবেক ন্যায্য টাকা। তবে তোমাকে কিছু আমার ছেড়ে দিতেই হবে। আচ্ছা, টাকা জুটিয়ে আন, তারপর বিশ, পঞ্চাশ যা তোমায় দিতে হয়, সে ত আমি দিবই।" শুনিয়া বছির আরও হতাশ হইল।

কানাই পুনরায় কহিতে লাগিল, "এই দেখ, করম আলী সেখ, চিনই ত, ঐ পশ্চিম পাড়ার—তিন বৎসর আগে দেড়শ' টাকা নিয়ে এক 'পাখী' জমি কিনে ছিল, বেটা এমন হারামখোর যে, টাকা দিয়ে জমি কিনে ধুম করে জমির শস্য খেত; কিন্তু তার বাপের হাড়, যদি এই তিন বৎসরের মধ্যে একটিও সুদের টাকা দিয়ে থাকে। এই ত সেদিন পাড়ার পাঁচ জন মাতব্বর নিয়ে এসে চার 'পাখী' জমি দিয়ে দলিল নিয়ে গেল। তারপর দেখ, কয়লাঘাটের হোছেন ব্যাপারী, সে নৌকা চালানের জন্য পাঁচশ' টাকা নিয়ে, কোথায় নৌকা চালাবে, না মজা ক'রে পুঁজি ভেঙ্গে খেতে লাগল। চার বৎসর পরে, ঐ কালুর কাছে শোন, দশ পাখী জমি দিয়ে তবে মিটমাট। ফটিক পরামানিক ত তোমার প্রতিবেশী, সে ব্যাটা বাপের কিছু জমি পেয়েছিল, তা রাখতে পারল না। আজ বাপের শ্রাদ্ধের জন্য একশ', কাল ছেলের অন্নপ্রাশনের জন্য পঞ্চাশ, পরশু দিন ঘোড়া কিনতে একশ'; এমনি টাকা

নিয়ে, বাস সব খতম ক'রে এখন ভিটাখানি পর্য্যন্ত আমাকে দিয়ে মামার বাড়ী গিয়ে উঠেছে। করম উল্লা মণ্ডল ক্ষেতের আইল নিয়ে মারামারি ক'রে হাকিম উদ্দিন সরকারের সঙ্গে ফৌজদারী জুড়ে দিল। বাপু, মানুষের পায়ে নড়ি লাঠি দিয়ে একটা ঘা দিয়ে বা একটা ঘা খেয়ে দৌড়ে ফৌজদারী করতে যাওয়া খুব সহজ; তারপর ফৌজদারীর মাল মশ্‌লা টান পড়ল; তখন কে দেখে যাদুমণির দৌড়াদৌড়ি! আস্‌ল আমারই কাছে। বল্ল, 'সরকার মশাই, সব মহাজন বাড়ী ঘুরে হয়রাণ হয়েছি; এখন আপনি টাকা দিয়ে যদি আমার মোকদ্দমা না বাঁচান, তবে আমি মারা যাই।' কোন দিন আসে না, আজ ঠেকায় পড়েছে বলেই ত এসেছে, আচ্ছা যেমন করে হোক, কুড়িয়ে টুড়িয়ে তাকে আড়াইশ' টাকা দিলাম। দেড় বৎসর মোকদ্দমা চালিয়ে সে ক্ষেতে নিজের স্বত্ব সাব্যস্ত করল, হাকিম উদ্দিনের পঁচিশ টাকা জরিমানা হ'ল। কিন্তু আর টাকা দেওয়ার নামটি মুখে নাই! অবশেষে গতবার মোকদ্দমা ক'রে তেরশ' টাকা তার নামে ডিক্রি করে নয় 'পাখী' জমি নিয়ে তবে ছেড়েছি। কিন্তু তোমার কথা বাপু বছির আলাদা, যদিও ইদানিং আমি জমির দিকেই একটু নজর দিয়েছি তবু তোমার জমির উপর আমার কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা নাই, তুমি টাকাটা জুটিয়ে পুটিয়ে আন, আমি বাদ সাদ কিছু দিয়ে নগদ টাকাই তোমার কাছ থেকে নিব।"

বছির কহিল, "আচ্ছা কাকা, বাড়ী যাই, মা'র সঙ্গে বুঝি কি করা যায়।"

কানাই কহিল, "হাঁ—তা বুঝবে বই কি, এ তো সহজ কথা নয়, পিতৃঋণ, যত শীঘ্র মাথা হ'তে এ বোঝা নামান যায় ততই মঙ্গল। মায়ের সঙ্গে বুঝো, পাড়ার আরও দশ জন মাতব্বরের সঙ্গে বুঝো।"

বছির বাড়ী আসিয়া সকলের সঙ্গেই বুঝিল, কিন্তু কেহ কোন কুল-কিনারার সন্ধান দিতে পারিল না। অবশেষে জমি বিক্রয় স্থির হইল। মাতব্বরেরা কহিল, "যদি 'পাখী' চারেক জমি নিয়া কানাই সরকার তোমাকে রেহাই দেয়, তবে অবশিষ্ট ছয় 'পাখী' জমিতে একটা হাল কোন মতে লটর পটর ক'রে চলতে পারে।" কয়েকজন মাতব্বরকে সঙ্গে লইয়া বছির পুনরায় সরকার মশাইয়ের নিকট গেল। অনেক কথাবার্ত্তা, অনেক রাগারাগি, অনেক কাঁদাকাটির পর কানাই কহিল, "জমির বাজার দর 'পাখী' প্রতি দেড়শ' টাকা আছে, আমি বছিরের বাপের নিকট কথায় আবদ্ধ আছি, কাজেই আমি বছিরকে মারতে চাই না ; তার জমি আমি 'পাখী' প্রতি দশ টাকা বেশী দিয়ে নিব। সে সাত 'পাখী' জমি দিয়ে আমার ঋণ মিটাক। জমি না দিতে চায়, বেশ, আমি জমি চাই না, আমাকে নগদ সাড়ে দশশ' টাকা দিক। আর সাড়ে তিনশ' টাকা আমি মাফ দিব। তোমরা ত জান, কোন খাতককে আমি এক পয়সা ছেড়ে দেই না। বছিরকে যে আমি ছেড়ে দিচ্ছি সে ওর বাপের খাতিরে ; কিন্তু কালকার মধ্যেই জমির দলিল শেষ হওয়া চাই। নইলে পরশু আমি নালিশ করব।"

কানাইয়ের পরামর্শ মানাই বছিরের কর্ত্তব্য ছিল ; সেও তাহা মানিতে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না। পাড়ার কাদের মণ্ডল কহিল, "কিচ্ছু দরকার নাই ওর টাকা দিয়ে ; বেটা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে কিনা, তাই অল্পে সবুর নাই। ব্যাটা নচ্ছার, পাজী, মিথ্যুক, ফাঁকি দিয়ে একটা এতিমের সর্ব্বনাশ শুরু করেছে! যাক, ও নালিশ করে করুক। বছির, তুমি সাফ্ জবাব দিবে, ও টাকার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাও যদি না টিকে, তবে হাকিমকে ধরে কিস্তি

ক'রে ধীরে ধীরে টাকা শোধ করবে। এক 'পাখী' জমিও ব্যাটা চাঁড়ালকে দেওয়া হবে না।" কাদেরের কড়মড়ায়মান দাঁত, মুষ্টিবদ্ধ হাত, দোলায়মান বাহু ও সতেজ আওয়াজ দেখিয়া সকলেই উৎসাহিত হইয়া উঠিল এবং এক নাছির সেখ ছাড়া আর সকলেই তাহাকে সমর্থন করিল। বছির অগত্যা তাহাতেই স্বীকৃত হইল। স্বীকৃত না হইয়া তাহার উপায় নাই। ইহাদের পরামর্শ মত কাজ না করিলে ইহারাই তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে। এদিকে কানাই আদালতে নালিশ দায়ের করিল।

মাতব্বরেরা পরামর্শ দিল, "উকীল সতীশ বাবু বড় ভাল লোক, তিনি দেশের জন্য ওকালতী ছেড়ে এখন ফকির সেজে কৃষক-বন্ধু হ'য়ে দেশের উপকারার্থে কাজ করছেন। তোমার পিতা যে স্বদেশী সভায় তোমাকে স্কুল ছাড়া করার কথা সৈয়দ সাহেবের নিকট প্রতিজ্ঞা করে, সে সভায় তিনিও খুব জোর বক্তৃতা করেন। এবার তাঁর কাছে যাও, তিনি এখন ওকালতী না করলেও এ মোকদ্দমা হ'তে বাঁচার সম্বন্ধে দুইটা সৎপরামর্শ অবশ্যই দিবেন।" বছির খুঁজিয়া খুঁজিয়া সতীশ বাবুর বাসায় গেল এবং কানাই কিরূপে তাহার পিতার নিকট হইতে ফাঁকি দিয়া উচ্চহারে সুদি তমস্সুক নিয়াছিল, এখন তাহার কি অবস্থা, তাহা একে একে সমস্তই বলিল। বছির হাত জোড় করিয়া কহিল, "বাবু, এখন হয় আমাকে সৎপরামর্শ দিয়ে এ মোকদ্দমা হ'তে বাঁচান, না হয় আপনারা দশ জন ব'সে স্বরাজের বিচার দ্বারা আমার এ বিষয়টা মীমাংসা ক'রে দিন।" সতীশ বাবু গম্ভীর ভাবে বেশ ধৈর্য্যের সঙ্গে সমস্ত কথা শুনিলেন এবং তেমনই গম্ভীর ভাবে করুণা মাখা স্বরে কহিলেন, "বাপু, তোমার বিষয়টি ত বড় জটিল দেখ্ছি। ওকালতী পরামর্শই বা তোমাকে কি দেই? দেশের মুখ চেয়ে খেলাফত ও স্বরাজ উদ্ধারের জন্য ত ওকালতী ছেড়ে দিয়েছি।

এখন ত আর ওকালতী পরামর্শও দিতে পারব না, আর মোকদ্দমা করতেও বলতে পারি না। আপোষে মিটানই ত ভাল বোধ হয়। তবে সে যখন নালিশ ক'রে ফেলেছে, তখন ত তোমাকে দেখছি একটা জবাব দিতেই হচ্ছে। তা আমার বাসার কৈলাশ বাবুর কাছে যেতে পার। উকীলটি বেশ, বোঝে শোঝেও ভাল, আর কাজ কামে যত্নও আছে ঢের।"

বছির সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, উনি আপনার কিছু হন না? যদি কিছু হন, যাতে আমার উপর একটু দয়া ক'রে আমাকে বাঁচা'য়ে মোকদ্দমা করেন, আপনি তাই একটু বলে দিন।"

সতীশ বাবু কহিলেন, "ও আমার কি হয় সে কথা বলে আর আমায় মিছামিছি লজ্জা দিচ্ছ কেন, বাপু? হতভাগাকে শতবার বল্লাম—'ওরে, বি, এল পাশ করেছিস, তা এখন অন্য কোন একটা রোজগারের পথ দেখ, আমি নিজেই ওকালতী ছাড়লাম, তুই আবার কোন মুখে সেই ওকালতী আরম্ভ করবি।' কিন্তু হতভাগা তা শুনলে কই? বাসায় এসে আড্ডাটি গেড়ে বসল। বাসায় ভাইয়ের অংশ আছে, ভাইপোকে এখন কি করে বলি, 'এখানে তোমার থাকা হবে না।' সেইজন্য ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তাই বন্ধ করে দিয়েছি। তোমার হিতের জন্য অন্য সময় ওকে যা বলতে পারতাম, এখন ত আর তা বলতে পারি না, বাপু! ছোকরা কিন্তু মোকদ্দমা করছে ভাল। ইতিমধ্যে অনেক বুড়া উকীলকে পেছনে ফেলেও জটিল জটিল মোকদ্দমা করেছে। তাতে কাজে ওর এত উৎসাহ জন্মেছে যে আর যে ওকে ওকালতী ছাড়াতে পারব সে ভরসাই আমি ছেড়ে দিয়েছি। তবে তুমি ওর কাছে একাই যেতে পার, ওর মনে দয়া আছে, গরীব কাঙ্গালের দুঃখ বোঝে। আর ঐ যে শালিসের কথা বল্লে বাপু, ঐটাই বাস্তবিক ভাল।

শালিস.ক'রে রোজই দুই.একটা বিবাদ মিটিয়েও দিচ্ছি। তবে কি জান, ঐ মহাজনগুলার সাথে পারা যায় না। ওরা আস্ত কসাই, কথা মানে না। তা ছাড়া এখন আমাদের ইংরেজের সাথে ঝগড়া, এ সময় কি. আবার দেশী ধনী লোকগুলাকে ক্ষেপান ঠিক্ হবে? হাজার হ'লেও ওরা আমাদেরই দেশী ভাই ত বটে!"

বছির কহিল, "তবে কি বাবু আমরা গরীব কাঙ্গাল মারা যাব?"

সতীশ বাবু সাগ্রহে কহিলেন, "না, না, মারা যাবে কেন, বাপু? ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, তাঁর কৃপায় যদি স্বরাজটা হ'য়ে যায়, তবে তোমাদের সব দুঃখ ঘুচবে। তোমাদের গরীব কাঙ্গালের জন্যই ত আমরা দলে দলে জেলে যাচ্ছি, অপমান অপদস্থ হচ্ছি।"

বছির নিরাশ হৃদয়ে বাড়ী ফিরিল। ফিরিবার কালে সতীশ বাবুকে বলিয়া আসিল, "বাবু, আমরা গরীব মূর্খ মানুষ, স্বরাজ বুঝি না; তবে ক্ষুধার জ্বালায় যখন অস্থির হই, তখন মনে হয় স্বরাজ যদি ভাল জিনিষই হয় তবে আমাদিগকে এই জমিদার মহাজনের জুলুম হ'তে বাঁচালেই আমরা স্বরাজ পাই; তার চেয়েও উঁচু দরের জিনিষ যদি স্বরাজ হয়, তবে সে স্বরাজ আপনাদের মত ভদ্র লোকদের জন্য, আমাদের জন্য নয়।"

বছির বাড়ী ফিরিয়াই শুনিল, ফতেমা কাঁদিতেছে। মার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, ফতেমাকে মাছ দিয়া ক্ষুদের 'জাউ' দেওয়া হইয়াছে। সে মাছ দিয়া 'জাউ' খাইবে না, ভাত চায়। বছিরের কলিজার বোঁটায় যেন একটা তীর বিঁধিল। আর একদিনের কথা তাহার মনে হইল। ভাত কম ছিল, ফতেমা মাছ বাঁচাইয়া আরও ভাত চায়, অথচ ভাত তখন নিঃশেষ। আয়শা তাহাকে কহিয়াছিল, "বছির, আর

মাছ মারিস না, মাছ মারলে বেশী ভাত খরচ হয়।” যে মাছ আজ থালার কোণে রাখিয়া ফতেমা কাঁদিতেছে, তাহাও বছিরই আগের দিন নিজ হাতে মারিয়াছিল। বছিরের পরিবারের অবস্থা এখন এরূপ দাঁড়াইয়াছে, মাঝে মাঝেই একবেলা ভাত ও একবেলা ক্ষুদের ‘জাই’ খাইয়া থাকিতে হয়। টাকা কর্জ্জ করিবে? তা কানাই সরকারের ঋণ থাকিতে আর কেহ তাহাকে টাকা দিতে চায় না। বছির ছাতাটা হাত হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বেড়া হইতে দা’ খানা টান দিয়া খসাইয়া হাতে লইল এবং ঘরে যেখানে মাছ মারা জালগাছটা ছিল, সেখানে গিয়া এক কোপে তাহা টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল। আয়শা চীৎকার করিয়া কহিল, “আরে কি করিস্, জাল কাটিস কেন?” “আজ হ’তে মাছ মারা খতম, তারই যোগাড় করছি,” এই বলিয়া বছির উঠানের এক কোণে পোলোর দিকে চলিল। “আরে পোলোটি কাটিস নে, ও দিয়ে যে মুরগী ঢাকি”, বলিতে বলিতে বছিরের মা বছিরের হাত হইতে পোলোটা কাড়িয়া আনিল। বছির দা’ খানা আবার ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ঘরে গিয়া গুম হইয়া বসিল। আয়শা আঁচলে অশ্রু মুছিল। হঠাৎ এই অভাবনীয় কাণ্ড দেখিয়া ফতেমা কান্না বন্ধ করিয়া ভয়ে ভয়ে ‘জাউ’ খাইতে লাগিল।

নছির শেখ বছিরের প্রতিবেশী, কিন্তু আজন্ম শত্রু। বছির দেখিত, নছির ও ফরিদের মধ্যে কথাবার্ত্তা ছিল না। সে শুনিয়াছিল যে নছির ও ফরিদের বাপের মধ্যে বাড়ীর সীমানা লইয়া একবার ঝগড়া হইয়াছিল। তাহারই ফলে এ বিচ্ছেদ। নছিরের ছেলে আব্দুল হামিদ ঢাকা মাদ্রাসায় পড়িত, সম্প্রতি পড়া ছাড়িয়া খেলাফতের কাজ করিতেছে। আজ দুই দিন হইল সে বাড়ী আসিয়াছে। বছির মনে করিল, একবার সে আব্দুল হামিদের কাছে তাহার বিপদের কথা বলে। তাহাদের দু’ জনার

মধ্যে ত আর কোন দুশমনি নাই ! বৈকালে সে আব্দুল হামিদের সঙ্গে দেখা করিয়া সব কথা বলিল। আব্দুল হামিদ উৎসাহ দিয়া কহিল, "আচ্ছা, তুমি ভয় ক'রো না বছির, কাল আমি তোমাকে নিয়ে সৈয়দ সাহেবের কাছে যাব, তিনি যদি কানাইকে জমি পত্তন না দেন তবে ও ব্যাটা নালিশ ক'রে কি করবে ? সাহেব আমাদের ঢাকা খেলাফত কমিটীর মেম্বর ; বিশেষতঃ তিনি মুছলমান। একটি গরীব মুছলমান প্রজার হিত যদি তাঁর দ্বারা না হয়, তবে আর তিনি পরগণারই বা মালীক কেন, দেশের কাজেই বা লেগেছেন কেন ?"

পরদিন বছিরকে সঙ্গে লইয়া আব্দুল হামিদ সৈয়দ সাহেবের দরবারে গেল। আব্দুল হামিদ ঢাকা-ফেরতা লোক। সে সহজেই সাহেবের সম্মুখে যাইবার অনুমতি যোগাড় করিল। তাহারা সব কথা সৈয়দ সাহেবকে বলিল। শুনিয়া সাহেব বলিলেন, "আচ্ছা আমি দেখব ; তুমি একটা দরখাস্ত রেখে যাও, আমি কানাইকে ডেকে কথাটা শুনে নেই।" বছির পুনরায় হাজির হইবার তারিখ ফেলিয়া বাড়ী ফিরিল। সংবাদ যথাসময়ে কানাইয়ের কানে গেল। সে প্রথমে কাছারীতে তদবির শুরু করিল ; বাজারের কয়েকটা বড় মাছ কিনিয়া কয়েকজন আমলার বাসায় পাঠাইল। তারপর সাহেবকে দশটাকা নজর দিয়া তাহার প্রার্থনা জানাইয়া আসিল। পেশকার বাদী বিবাদীর নালীশ ও জবাবের নথি সাহেবের নিকট পেশ করিতে করিতে সাহেবকে বিষয়টি বুঝাইয়া দিল, "বাদী ছোট লোকের ছেলে, দুই অক্ষর লেখাপড়া শিখে আর কাউকে মান্‌তে চায়না ; আমাদিগকে সব সময় সেলামটা করতেও নারাজ। এবার সে মহলে রটিয়ে দিয়েছিল যে চৌকিদারী ট্যাক্স, জমিদারী খাজনা, এসব কিছুই আর দিতে হবে না, তার ফলে ও মহল হ'তে এবার দুই হাজার টাকা

কম তহ্‌শীল হয়েছে ; যা আদায় হয়েছে তা ঐ বিবাদী কানাই সরকার মহলের লোককে বুঝিয়ে বলেছে তারপর। বিশেষতঃ জমি যত হস্তান্তর হয় ততই সরকারী লাভ। দশ 'পাখী' হস্তান্তরিত হ'লে দশ আধে পাঁচ শ' টাকা নজর ত বাঁধাই আছে।"

ইহার পর বছির সাহেবের নিকট গেলে তিনি যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। রাজবাড়ীর অন্দর হইতে ফিরিবার সময় সাহেবের জেল ফেরত ছেলে দুদুমিঞা বছিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, তোমাদের কাজ হ'ল?" বছির তাঁহাকে সব কথা বলিল। কহিল, "হুজুর, আমরা গেরস্ত ব'লে ঘেন্না ক'রে সেরেস্তায় চাকুরী দিবেন না, আবার যে মাটী নাড়া চাড়া ক'রে গেরস্তগিরি করব, জমা জমি মহাজনকে পত্তন দিয়ে আমাদিগকে তাও করতে দিবেন না।" দুদুমিঞা সহানুভূতির স্বরে কহিলেন, "কি করব ভাই, বাপ বুড়া মানুষ, তাঁর কথার উপর ত আর কথা বলতে পারি না—আমলাগুলিও ঘুষ খেয়ে দিনকে রাত আর রাতকে দিন করতে মজবুত। কিন্তু সব দেখব, জমিদারী হাতে এলে।" বছির কহিল, "হুজুর যে ভাল মালীক হবেন, তা আমরা সবাই হুজুরের ব্যবহার দেখেই বিশ্বাস করি ; হুজুরের জমিদারী ও সতীশ বাবুর স্বরাজ পাবার আগেই যে দেশের গরীব কৃষক ম'রে সাফ হবে, তার উপায় কি?" দুদুমিঞা করুণ চোখে চুপ করিয়া রহিলেন।

রাজবাড়ীর বাহিরে আসিতেই খেলার মাঠের ধারে সতীশ বাবুর সঙ্গে দেখা হইল। তিনি কয়েকজন লোক খাটাইয়া তাঁবু টানাইতেছিলেন। বছিরের সহিত আব্দুল হামিদকে দেখিয়া তিনি কহিলেন, "তারপর, তুমি কবে বাড়ী এলে হামিদ? তুমি ত খেলাফতে খুব ভাল কাজ ক'চ্ছ,

আমরা এখান হ’তেই খবর পাচ্ছি, আজ বৈকালে এখানে সভায় আসছ ত ?”

আব্দুল হামিদ—“কিসের সভা, মশাই ?”

সতীশ—“কেন, জান না আজ যে এখানে বিরাট রায়ত সভা। সৈয়দ সাহেব স্বয়ং সভাপতি হবেন, রমেশ বাবু, হরিশ চাটুর্য্যে, জুলফক্কার মিঞা সবাই থাকবেন।”

আব্দুল হামিদ—“এর মধ্যে ত রায়ত কাউকে দেখি না, মশাই! সবাই যে তালুকদার, মহাজন, জমিদার, উকীল, ডাক্তার।”

সতীশ—“তা রায়তও থাকবে। আর রায়ত সভা হ’লেই যে তাতে কেবল রায়তই থাকবে, এর কি মানে আছে ? তুমি ত বাপু শহরের ছেলে, সব খবরই রাখ। এই যে জজ্ উড়রফ সাহেব ও মারওয়াড়ীরা “কাউ কনফারেন্স” করেছে তাতে কি কাউ অর্থাৎ গরুর সভা বসে; যারা গরু হিতৈষী তাদের সভা বসে। রায়ত সভাতেও রায়তের যারা হিতৈষী তারা আসবে বই কি ?”

আব্দুল হামিদ—“আজকার সভায় আলোচনা হবে কি ?”

সতীশ—“প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন প্রস্তাবের ঘোর প্রতিবাদ। এই আইন পাশ হ’লে কিন্তু তোমাদের মত কৃষকের সর্ব্বনাশ। এই যে হাজার হাজার লোক বর্গা চ’ষে খায়, এদের উপায় হবে কি ? বর্গা জমিতে প্রজাস্বত্ব দিতে গেলেই বর্গাদাতারা জমি পতিত ফেলে রাখবে, তবু বর্গা দেবে না। বর্গাদাতাদের কি ? ডাক্তারী, ওকালতী, কারবার, কি আরো দশটা রোজগারের পথ তাদের আছে, মধ্যে প’ড়ে মারা পড়বে এই চাষাগুলা ; বুঝলে না এই সাদা কথাটা ?”

আব্দুল হামিদ—“বুঝেছি, আপনারা জমিদার তালুকদারেরা যেখানে

যে পতিত, হালট, গোচারণ ভূমিগুলি ছিল, তাতে প্রজা পত্তন ক'রে যখন দেখলেন যে আপনারা বাজারের দুধ ঘি কম পান, কারণ গাই ঘাস পায় না, তখন 'গোজাতি-উন্নতি বিধায়িনী সভা' ক'রে চাঁদা তুলে গো-হত্যা নিবারণ দ্বারা গরুর উন্নতির চেষ্টা ক'চ্ছেন। এবার এই বছির আপনার ও সৈয়দ সাহেবের দুয়ারে ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হ'ল, তার জমিগুলা মহাজনের হাত হ'তে রক্ষা করতে চেষ্টাও করলেন না। আপনা-দের দশটা রোজগারের পথ খোলা থাকতে, কৃষকের একমাত্র উপায় জমিগুলি এমনিভাবে দিন দিন কেড়ে নিয়ে কৃষককে বর্গাদার ক'রে তুলে আজ সেই বর্গাদারের হিতের জন্য সেই আপনি ও সৈয়দ সাহেব আপনা-দেরই মত আরো দশজন নিয়ে আজ রায়ত সভা করবেন। যে জমিগুলি আপনারা অকৃষকেরা দুই দিন আগে নানা ছল ছুতায় কৃষকদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন, আজ সেইগুলিতে সেই দরিদ্র কৃষকের সামান্য স্বত্ব জন্মিতে পারে এই আশঙ্কায় কৃষকের নাম দিয়ে আপনারা অকৃষকেরা দেশময় চীৎকার কচ্ছেন। আপনাদের পায়ে সহস্র সালাম।"

এই বলিয়া দুইজন হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। সতীশ বাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "গবর্ণমেণ্ট ও মডারেটরা যে বলে যে নন-কো-অপারেশনে দেশে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছে, তা একেবারে মিথ্যা নয়। এই ছোকরাগুলা মুরুব্বির মুখ চেয়েও একটা কথা বলে না।"

আদালতে মোকদ্দমা উঠিল। গ্রামের মাতব্বরেরা বছিরের পক্ষ হইয়া অনেকেই সাক্ষ্য দিল; কিন্তু বছিরের জবাব টিকিল না। বছির সুদ কমাইয়া দিতে প্রার্থনা করিল; হাকিম বলিলেন, "নগদ টাকা দাও, সুদ কমিয়ে দিচ্ছি।" কিন্তু বছিরের টাকা কোথায়? সে কিস্তিবন্দি চাহিল,

হাকিম কহিলেন, "কিস্তি করলে তুমি বাপু মারা পড়বে। কিস্তির টাকা সময় মত দিতে না পারলে আবার কিস্তি খেলাপী স্থদ হবে, টাকা বাড়বে, ভিটা ছাড়া হবে ; তার চেয়ে আমি এক সপ্তাহ সময় দিচ্ছি, বাইরে মোকদ্দমা আপোষে মিটাও।" তাহাই হইল। নয় 'পাখী' জমি দিয়া বছির মোকদ্দমা আপোষ করিল। এক 'পাখী' জমি ও বসত ভিটা তাহার রহিল।

(৬)

বেলা নয়টা। এমন সময় বিলের মাছ ধরার উৎসবে আনন্দ ধ্বনি করিতে করিতে গ্রামের লোক পোলো, জালি, ভেওয়াইল, জাল যাহার যাহা ছিল লইয়া বিলের দিকে ছুটিল। আয়শা কহিল, "যা না বাবা, দু'টা মাছ মেরে নিয়ে আয়। শুধু-ভাত খেতে খেতে যে আত্মা কাঠ হ'য়ে গেল!" বছির বরাবরই মাছ ধরতে পটু। বিলে মাছ ধরার চীৎকার শুনিয়া মাছ ধরা সম্বন্ধে তাহার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলিয়া গেল। তাড়াতাড়ি পোলোটা লইয়া বিলের দিকে ছুটিল।

বিলের মাছ ধরা শেষ হইল। বছির মাঝারি রকম দুইটা বোয়াল মাছ ধরিল ; কিন্তু বাড়ী যাওয়ার কথা মনে হইতেই তাহার প্রতিজ্ঞার কথা মনে হইল। সে মাছ দুইটা রাখিয়া ধীরে ধীরে গোছল করিতে লাগিল। ডাঙ্গায় উঠিয়া সে মাছগুলি সামনে লইয়া বসিল। মাছ দুইটা মাঝে মাঝে মাটীতে লেজ আছড়াইতে লাগিল। মাথার উপর আগুনের মত সূর্য্য-কিরণ বর্ষিত হইতেছিল। কিন্তু বছির বসিয়াই রহিল। সে ভাবিতে লাগিল, কেন সে মাছ ধরিতে আসিয়াছিল। যে দুপুরে দেশী আলু সিদ্ধ খায়, বৈকালে আধপেটা ভাত খায়, তার এ সাধ কেন?

মাছ দেখিয়াই ত ফতেমা আলু ছাড়িয়া ভাতের আবদার শুরু করিবে; যদি তাহাকে সমস্ত ভাত দেওয়া যায়, তা হইলে তাহার কচি বয়সের স্ত্রী কি খাইবে? সে কি তাহার মাকে ছাড়া ভাত খাইতে পারে! মা কি বলবে? আচ্ছা. যদি ফতেমাকে এ বেলা ভাত দেওয়া যায়, তবে বৈকালের উপায় কি? মাছ পাইলে ত সে বেলাও ভরপেট খাইবে। ঘরে চাউল নাই, কে তাহাকে চাউল কর্জ্জ দিবে? কর্জ্জ যদিই বা পাওয়া যায়, সে তাহা শোধ করিবে কি উপায়ে? এই চিন্তাগুলি আগুনের হলকার মত তাহার মাথার ভিতর ঘুরিতে লাগিল, উপরে যে মাথা ফাটা রোদ ছিল, তাহা তাহার খেয়ালই হইল না। প্রায় এক ঘণ্টা এইরূপে গেল। তাহার পর সে উঠিল, দড়িতে বাঁধা মাছ দুইটি হাতে লইয়া বিলে নামিল। জল পাইয়া মাছগুলি লাফালাফি করিতে লাগিল। বছির মাছ দুইটি একবার জলে ডুবায় আবার তোলে; কয়েকবার এরূপ করিয়া ধীরে ধীরে মাছ দুইটির মুখ হইতে দড়ি খসাইয়া ছাড়িয়া দিল। বিপুল আনন্দে মাছ দুইটি মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইল। সে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া মাছের পুচ্ছ আন্দোলিত জলের ঢেউ দেখিতে লাগিল। যখন ঢেউ থামিল, তখন সে ধীরে ধীরে পোলোটা কাঁধে লইয়া বাড়ী চলিল।

বাড়ী হইতে কিছু দূরে থাকিতেই বছির দেখিল, ফতেমা বাড়ীর সামনে পথে তাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। অন্য দিন বছির মাছ পাইলে সে দৌড়িয়া আসিয়া তাহার হাত হইতে মাছ কাড়িয়া লইয়া তাহার মা ও ভাবীকে দেখাইতে চীৎকার করিতে করিতে বাড়ীর দিকে ছুটে। আজ বছির কাছে আসিলে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই মাছ পাও নাই?" বছির কহিল "না"।

ফতেমা বলিল "আজ সব লোকে এত মাছ পেলে, আর তুমি একটাও মাছ পেলে না ?"

বছির ধমক দিয়া উঠিল, "তবে কি আমি মিছা কথা বলছি ? সর পথ থেকে।" ফতেমা এ ধমকের জন্য প্রস্তুত ছিল না। নিরাশায় দুঃখে অভিমানে সে কাঁদিয়া ফেলিল। বছির তাড়াতাড়ি তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া নিজে চোখের জল মুছিল। অন্দরে তাহার মা ও স্ত্রী দুই জনে দুই চরকায় সূতা কাটিতেছিল। সেই সৈয়দ সাহেবের সভা হইতে ফিরিয়া ফরিদ চরকা আনিয়া দিয়াছিল। তখন আয়শা মাঝে মাঝে সখ করিয়া সূতা কাটিত। এখন রোজই প্রয়োজনের খাতিরে চরকা চালায়। এই সূতা হইতে শ্বাশুড়ী বৌয়ের নিজেদের ও বছিরের ফতেমার কাপড় হইয়া যায়; কোন সময় বা সূতা বেচিয়া লবণ মরিচের খরচটাও চলে। বছির আসিতেছে জানিতে পারিয়াই, আয়শা চরকা থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি মাছ পেয়েছিস আজ বছির ?" বছির গম্ভীর ভাবে "কিছুই পাইনি" বলিয়া পোলোটা উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ঘরে ঢুকিল। আয়শা কহিল "আরে, পোড়া কপাল! রোজ দুপুরে আলু সিদ্ধ, বৈকালে নুন ভাত খেতে খেতে সোণার চাঁদ বৌটি কাল হয়ে গেল, ফতেমাটাও একেবারে টুনি পক্‌খী হয়ে গেল। সেদিন খানিকটা চরকার সূতা বেচে চারটা চা'ল এনেছি যে মাছ পেলে একদিন পেট ভ'রে ওদের মুখে চারটা ভাত দিব। আজকে একেবারে খালি হাতে এলিরে বছির!" বছির ঘর হইতে গর্জ্জিয়া উঠিল, "বলি চালটাল যে ঘরে রেখেছ, তাই কি বলেছ কোন-দিন, না আমি অন্যের অন্তরের খবর রাখি ?" আয়শা স্নেহমাখা কণ্ঠে কহিল, "রাগ যে করিস রে পাগলা, আমি সে কথা আগে

বললেই কি তুই মাছ পেতিস?” বছির চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নছির শেখ গোছল করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। যাইতে যাইতে সে বছির ও তাহার মায়ের কথা শুনিল। সে বছিরকে মাছ ছাড়িয়া দিতে দেখিয়াছিল, কারণ বুঝিতে পারে নাই। পূর্ব্বশত্রুতা হেতু কথাবার্ত্তা নাই; কাজেই কিছু জিজ্ঞাসাও করিতে পারে নাই। তবে সে আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছিল যে এ অদ্ভুত ব্যাপারের মানে কি? মাতা পুত্রের কথা শুনিয়া সব রহস্য তার কাছে খোলসা হইয়া গেল। সে বাড়ী গিয়াই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, “ভাত টাত কি পাক হ’ল?” স্ত্রী কহিল, “গরম ভাত আর হামিদ যে মাছ মেরেছিল তার ‘সালুন’ আছে।” নছির কহিল, “বেশ, বছিরের মা, তার স্ত্রী ও ফতেমার জন্য এখনি ভাত ‘সালুন’ পাঠিয়ে দাও, তাদের উপোস যাচ্ছে; তোমাদের কম পড়ে, পরে রান্না করে খাও; আর তুমি যাও, বাবা হামিদ, বছিরকে ডেকে আন, আজ তাকে নিয়ে এক সঙ্গে খেতে হবে।”

আব্দুল হামিদ বছিরকে ডাকিয়া আনিল। বছির তখন ঘরে একা ভাবিতেছিল। কি ভাবিতেছিল হয়ত নিজেই প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিত না; কিন্তু বড় তীব্র আগুনের ভাবনা ভাবিতেছিল। হামিদ ডাকিতেই সে যেন সেই রাক্ষসী চিন্তার হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার একটা সুযোগ পাইল। নছির তাহাকে ডাকিয়াছে শুনিয়া, সে একটু আশ্চর্য্য বোধ করিল। যাহাদের সহিত বহুকাল হইতে কথাবার্ত্তা বন্ধ, আজ হঠাৎ তাহাদের আবার ডাক কেন? বছির গিয়া দেখিল, একটা বিছানায় নছির বসিয়া আছে, তাহার সামনে তিন থালা ভাত। তাহাকে দেখিয়াই নছির কহিল, “আয় ত বাবা বছির, চল হামিদ,

আমরা আজ তিন জনে বসে একত্র চারটা ভাত খাই।" বছির ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, নছির কহিল "শরম কি বাপু, এস; আমি তোমাদের সব কথা জেনেছি, তোমাদের বাড়ীর আর সবার জন্য ভাত পাঠিয়েছি।" বছির ওজু করিয়া আসিল; ভাত সামনে লইয়া বসিল; তাহার পর হঠাৎ নছিরের দুই হাত নিজের দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "চাচা, আমি এভাত খেতে পারি যদি তুমি আমার একটা উপকার করতে রাজী হও।"

নছির—"আচ্ছা, আচ্ছা, সে শুনব পরে, আগে ভাত খেয়ে নেও।"

"না চাচা, তোমায় কছম করতে হবে আগে, তবে আমি খেতে বসব।"

নছির গম্ভীর স্বরে কহিল "যদি আমার সাধ্যে কুলায়, বছির, তবে ইনশা আল্লাহ্ তোমার উপকার আমি করব।"

আহারের পর বছির কহিল, "এখন আমার এক 'পাখী' জমি ও ভিটা-টুকু আছে। এতে যে চলে না, চলতে পারে না, তা তুমি নিজেই জানতে পেরেছ। আমার একটি খালাতো ভাই আসামে গিয়ে বড় জোতদার হয়েছে। তার লোকের অভাব। সে লিখেছে, যদি আমি যাই তবে সে আমাকে কিছু জমি এখনই দেয়, পরে আরও ক'রে নেওয়া যাবে। এখন আমাদের এই চারিটি লোকের যাওয়ার পথ খরচ চাই। কিছু হাতে নিয়েও সেখানে পৌছা চাই। তাই আমার ভিটা জমিটুকু বিক্রির ইচ্ছা। এ অন্য গ্রাহকে সহজে নিতে চাইবে না। কারণ শেষ জমি ও ভিটা বিক্রয়, জমিদারে খাস করতে পারে। নজরের হারও উচ্চ হবে। গ্রামে দুষ্ট লোকের অভাব নাই। তুমি এ ভিটা নিলে কেউ কোন চক্রান্ত করতে সাহস পাবে না! তুমি ভিটাটা নিয়ে আমাকে আসামে পাঠিয়ে দাও।"

নছির মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কত টাকা হ'লে তুমি আসামে যেতে পার?"

"দুইশ' টাকা হ'লে আমার বেশ ভাল হয়। অন্ততঃ সোয়াশ' টাকায় চলে।"

নছির মৃদুহাস্যে কহিল, "আচ্ছা, যদি আসামে গেলে তোমার ভাল হয় মনে কর তবে যাওয়ার যোগাড় কর। আমি তোমাকে নগদ দুইশ' টাকা দিব। ভিটা বাড়ী আমি চাই না, ও অমনি থাকুক। যদি তোমাকে ফিরে আসতে হয়, ঐ বাড়ীতে আবার উঠতে পারবে; আর যদি ওখানে গিয়ে সুবিধা হয়, পরে দলিল ক'রে দিও।"

বছির কহিল "না, চাচা, তা হয় না, জমি বিক্রি দলিল না করলে জমিদার খাস করবে, জমি আমি 'কওলা' করেই দিব। আর যদি আমাকে ফিরেই আসতে হয়, তবে এ বিশ্বাস আমার আছে, চাচা, তোমাকে ধ'রে ঘর তোলার একটু জায়গা ক'রে নিতে পারবই।" তাহাই ঠিক হইল, ভিটা বাড়ী নছিরের নামে কওলা হইল।

(৭)

আজ বছিরের বিদায়ের দিন। প্রভাত হইতেই বাড়ীতে কান্নার রোল উঠিয়াছে। ফতেমা, আয়শা, বছিরের স্ত্রী সকলেই কাঁদিতেছে। বছিরের স্ত্রীর আত্মীয়েরা আসিয়াছে, তাহারাও কাঁদিতেছে। বছিরের চোখও শুষ্ক নয়। প্রতিবেশীরা চোখ মুছিতেছে, প্রতিবেশিনীরা আয়শার গলা ধরিয়া, ফতেমাকে কোলে লইয়া, বছিরের স্ত্রীর মাথায় হাত দিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছে, সে হৃদয়-বিদারক দৃশ্যে পাষাণও গলে।

সকলেই বছিরের জন্য, আয়েশার জন্য আফসোস করিল। কেবল

কানাই সরকার বছিরের বিদায়ের কথা শুনিয়া দাঁত কিড়মিড় করিয়া কহিল, "ব্যাটা নিমক হারাম, বাপ গোষ্ঠীতে মিলে খেয়ে বেঁচে গেল আমার টাকায়, আর ভিটা বাড়ী দিয়ে গেল নচ্ছার ব্যাটা নছির শেখকে।"

তিনটি ডুলিতে আয়শা, বৌ ও ফতেমা চলিল। একটা গরুর গাড়ীতে হাড়ি পাতিল, কাঁথা কাপড় ইত্যাদি ও চরখা দুইটি চলিল। বছির হাঁটিয়া রওনা হইল। জাহাজ ঘাট এখান হইতে আট মাইল; তাড়াতাড়ি যাইতে হইবে। ডুলির ভিতর হইতে হৃদয়-ফাটা কান্নার রোল বাহির হইতে লাগিল। শূন্য ভিটায় দাঁড়াইয়া কয়েকজন প্রতিবেশিনী কাঁদিতে লাগিল। তখন গাড়ী ও ডুলি অগ্রসর হইল, বছির সকলকে সালাম করিয়া বিদায় লইল। শেষে আসিল আব্দুল হামিদ। সে বছিরকে কহিল, "ভাই, এ বোধ হয় আমাদের শেষ দেখা, মাফ ক'রো, আমাদের কথা একেবারে ভুলো না।" বছির আব্দুল হামিদের হাত ধরিয়া অশ্রু-ভারাক্রান্ত কণ্ঠে কহিল "হাঁ ভাই, ইহজীবনে হয়ত এই আমাদের শেষ দেখা। কিন্তু এ শেষ দেখা নাও হ'তে প্যারে। কারণ যদি দেশে মহাজন জমিদারের জুলুম এমনি ভাবে চলতে থাকে, তবে দু'দিন আগে হোক্ আর দু'দিন পরে হোক তোমাদিগকেও দেশ ছেড়ে আসামে যেতে হবে। তখন হয়ত আবার দেখা হবে।

ছাই

(১)

কাছারীতে ঢুকিয়া ম্যানেজার বাবুকে সেলাম দিতেই তিনি ভ্রূভঙ্গি করিয়া কহিলেন : "কিরে ব্যাটা, বড় যে নবাব হয়েছিস দেখছি ; এ কয়দিন কাছারীতে গরহাজির কেন ?"

গরীবুল্লা হাত জোড় করিয়া কহিল, "বাবু, আজ চারদিন যাবত আমার বাপ মরার মত ঘরে পড়ে আছে, তার জবান বন্ধ, পানির ফোটাও খায় না ; সারা দিনরাত তার কাছে থাকি, কি জানি কখন্ জান্টা বের হ'য়ে যায় ; এদিকে রাত জাগতে জাগতে আমারও শরীরটা একটু ব্যারাম—;" কথা শেষ না হইতেই ম্যানেজার বাবু মুখ খিচাইয়া কহিলেন, "ব্যাটা, আমি এসব কেচ্ছা শুনতে ত তোকে ডাকি নাই ; যদি চাকরীর সাধ থাকে, তবে আজ বৈকাল হ'তে তোকে আমি কাছারীতে হাজির চাই, নইলে কাজে ইস্তাফা দিয়ে বাড়ী গিয়ে নবাবী কর।"

গরীবুল্লা আবার হাত জোড় করিয়া কহিল, "একটা হপ্তা আমায় মাফ দেন, বাবু, তারপর—তারপর আমার বাপেরে আমি মাটীর তলে থুইয়ে চাকরীতে আসব—এক হপ্তা আর আমার বাপ কিছুতেই বাঁচবে না," কহিতে কহিতে সে হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিল, ম্যানেজার বাবু আরও গরম হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "ন্যাকামী রাখ, ব্যাটা শা—" কথার শেষভাগে কতকগুলি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বোধক শব্দ ব্যবহার করিলেন।

গরীবুল্লা তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া এবার গলায় কাপড় লইয়া বাবুর দুই পা জড়াইয়া ধরিল। বাবু সজোরে পা ছাড়াইয়া লইয়া আবার কটূক্তি বর্ষণ করিলেন। গরীবুল্লা উঠিয়া কহিল, "বাবু, আজ বৈকালে কাজে আসা আমার পক্ষে অসম্ভব, আমার ইস্তাফা মঞ্জুর করুন।" জ্বলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতি হইল ; বাবু গর্জ্জিয়া কহিলেন, "কি বল্লি, বেহায়া, বেল্লিক, হারামজাদ, ইস্তাফা ?—এই দিচ্ছি। খানা বাড়ীর প্রজা, তার উপর কাছারীর পেয়াদা, দেখেছ তবু ব্যাটার আস্পর্দ্ধা! বরকন্দাজ, এই শা—র দুই কান ধ'রে ওখানে বসিয়ে রাখ ; শুমার নবীশ বাবু, আপনি এক্‌খনি দেখে দিন ত ওর নামে বাকী খাজনা কত ?" হুকুম মোতাবেক কাজ হইল ; শুমার নবীশ কাগজ হাতড়াইয়া কহিলেন, "ওর পাঁচ বছরের খাজনা বাকী—পঞ্চাশের উপর উঠেছে।"

ম্যানেজার বাবু কহিলেন, "হাঁ, বাকী রেখে উপকার করার এই কৃতজ্ঞতা! বরকন্দাজ, এক্‌খনি এই নিমকহারাম কুত্তাটাকে গর্দ্দানী দিতে দিতে মালখানায় নিয়ে যাও, খাজনা পরিশোধ ক'রে দিয়ে তবে খালাস পাবে।"

গরীবুল্লার বাপ রাজবাড়ীতে চাকুরী করিয়া চুল পাকাইয়াছে, আজ সে মরণপথে ; গরীবুল্লাও আজ দশ বৎসর যাবত কাছারীতে পেয়াদাগিরি করিতেছে ; সুতরাং হুকুম মোতাবেক গরীবুল্লাকে গর্দ্দানী দিবে কিনা, ভাবিয়া বরকন্দাজ ইতস্ততঃ করিতেছিল ; বাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, জমাদার এই দুইও শা—কে কান মলতে মলতে মালখানায় তোল ত।" হুকুম শুনিয়া আর জমাদারকে নড়িতে হইল না, অবিলম্বে বরকন্দাজ গরীবুল্লাকে গর্দ্দানী দিতে দিতে মালখানায় লইয়া গেল এবং বাবুর সুনজর পুনঃ বহাল করিবার

উদ্দেশ্যে গরীবুল্লার পীঠে কয়েকটি মুষ্ট্যাঘাতও করিল ; বাবু বরকন্দাজের কার্য্যতৎপরতা দৃষ্টে খুশী হইয়া অন্য কাজে মনোনিবেশ করিলেন।

কতক্ষণ সে মালখানায় থাকিত, বলা যায় না ; কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই রাজবাড়ীতে কি একটা পত্র আসায় আনন্দের রোল পড়িয়া গেল। সাহেব বৈকালে বাহিরে যান, কি জানি ব্যাটার কান্নাকাটী শুনিয়া সাহেবের সন্ধ্যা ভ্রমণের ব্যাঘাত হয়, তাই তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল—অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে উপদেশও দিয়া দেওয়া হইল, "আগামী তিন দিনের মধ্যে খাজনা পরিশোধ ক'রে না দিলে, তোর ভিটায় ঘুঘু চরবে।" ম্যানেজার চালাক মানুষ, সাহেবের মেজাজ বুঝিয়া কাজ করিতেন ; তিনি জানিতেন যে 'স্লিপ' ছাড়া কোন আগন্তুককে সাহেবের বৈঠকখানায় যাইতে দিলে, সাহেবের তরফ হইতে পাহারাওয়ালার উপর খুব গজব হয়, আবার বাহিরে বেড়াইতে বাহির হইলে যদি কোন প্রজা বা চাকর সামনে পড়িয়া কাঁদাকাটী করে, তবে সাহেবের ম্যাজাজ একদম আগুন হইয়া যায় এবং সে রাগের জের সঙ্গীয় মোছাহেব, আমলাদের উপরও গিয়া গড়ায়।

(২)

গরীবুল্লার মায়ের কাছে মালখানার খবর আগেই পৌছিয়াছিল ; গরীবুল্লাকে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়াই অপ্রত্যাশিত আনন্দে তাহার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। গরীবুল্লা পাষাণের মত স্থির কণ্ঠে কহিল, "কেঁদ না, মা, বাপজানের এই সময়, এখন কি কাঁদতে আছে।"

মা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "আমাদের এখন কি উপায় হবে ?

গরীবুল্লা উপরের দিকে দেখাইয়া কহিল, "সবাই যদি ছেড়ে যায়, মা, তবে ও ব্যাটা কি ফেলে দিতে পারবে ?"

আরও দুই দিন পরে গরীবুল্লার বাপের হুঁশ হইল, সে কথা কহিল। গরীবুল্লার মায়ের আশা হইল, এবার বুঝি খোদা দয়া করিলেন ; আশা হইতেই সে কাঁদিয়া মালখানা, বাকী খাজনা, চাকুরী ইস্তাফা ইত্যাদির সব কথা স্বামীকে বলিল। বুড়া নীরবে সব কথা শুনিল, তাহার পর গরীবুল্লাকে কাছে ডাকিয়া কহিল, "আমি ত বিছানা ছেড়ে উঠতে পারি না, আর বোধ হয়, পারবও না, যদি পারতাম, একবার আমি নিজে গিয়ে তোমার কথা সাহেবের কাছে ব'লে দেখতাম ;—আর বলবই বা কাকে ? শরীকী মামলার সময় যার জমিদারী রক্ষা করতে গিয়ে অন্যকে খুন করেছি, নিজে জখমী হয়েছি, জেলে পচেছি, জান পণ করে লড়েছি, সেত আর এখন নাই ; এখন যে মালীক আছে, সে ছিল তখন শিশু, কাজেই সে ওসব খবরও রাখে না, আমাদেরকে কদরও করে না ;—আহা ! এর বাপের মত অমন একটা জমিদার কি হয় !!" বলিয়া বৃদ্ধ কাঁদিয়া উঠিল। স্থির হইয়া আবার সে বলিতে লাগিল, "অবস্থা যখন এই, তখন আমি বলি, যদি সাহেব তোমাকে মাফ ক'রে এখানে থাকতেও দেয়, তবু আর এখানে থাকিস নারে, বাবা ! জমিদার বাড়ীর কাছে থাকলে ফুটফর-মাইস ক'রে দিনটা গুজরাণ হ'য়ে যায় বটে, কিন্তু তাতে বড়ই জিল্লতি ; তাদের উপর দুইটা বল ভরসা করা অবশ্যই যায়, কিন্তু কখন যে আবার হঠাৎ বাজ এসে মাথায় পড়ে, তার ঠায় ঠিকানা নাই। 'খোলাবান্দা' গিয়ে একটা বাড়ী ক'রে, জঙ্গল কেটে যদি কয়েক 'পাখী' জমি বের ক'রে নিতে পারিস, তবে সেই মাটী নেড়ে চেড়েই এক রকম চ'লে যাবে।"

(৪)

ইহার একদিন পরে স্ত্রী পুত্রের মায়ার ডোর কাটিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেল। গরীবুল্লা অশ্রু মুছিয়া দা হাতে কাঁচা বাঁশ আনিতে ঝাড়ে চলিল। সংবাদ ম্যানেজার বাবুর অবিদিত রহিল না। তিনি কহিলেন, "আজ বাদে কাল হবে ও বাড়ীটা রাজবাড়ীর খামার, ওখানে ও কবর টবর দিতে দেওয়া যায় না।" সাহেব তখন যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন, লোকজন সব তৈয়ার। এমন সময় ম্যানেজার বাবু সাহেবের সামনে একটা কাগজ দস্তখতের জন্য ধরিলেন। সাহেবের মেজাজ আজ বড় মোলায়েম, তিনি প্রসন্ন হাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ম্যানেজার বাবু, খুব জরুরী কি ?"

ম্যানেজার বাবু কহিলেন, "হাঁ, হুজুর, ঐ যে বলেছিলাম, খানা বাড়ীর প্রজা একটা বেয়াড়া পিয়াদার কথা—তারই ভিটা সম্বন্ধে আদেশ।" সাহেব কলম তুলিয়া খচ্ করিয়া সংক্ষেপে নামটা সহি করিয়া কহিলেন, "হাঁ, ম্যানেজার বাবু, এমনই আমাদের কর্ত্তব্য করতে হবে ; যত আনন্দের কারণই হোক না কেন, এষ্টেটের কাজ দস্তুর মত করতে কিন্তু আমরা কেউ গাফ্‌লতি করব না।"

ম্যানেজার বাবু স্নিগ্ধ হাসিতে মুখখানা ভরিয়া, সেলাম দিয়া কহিলেন, "সে কি আর, হুজুর, বলতে ? হুজুরের সম্মানেই ত আমাদের সম্মান ; দিন দিন হুজুরের সম্মান বাড়বে, আমরাও দ্বিগুণ উৎসাহে এষ্টেটের কাজ চালাব।"

হুকুমনামা দস্তখত হইতেই গরীবুল্লার বাড়ীর দিকে একজন বরকন্দাজ ছুটিল। তখন গরীবুল্লা কোদাল হাতে কবর খনন করিতেছিল ; বরকন্দাজ গিয়া জানাইল, "বাবুর কড়া হুকুম, খোদ সাহেবের দস্তখত, এ

বাড়ীর উপর কোন কবর দিতে পারবে না।" গরীবুল্লা প্রথমে কথাটা বুঝিতে পারিল না, মোটের উপর সে কথাটা শুনিয়াছিল, কিন্তু তাহার কানকে বিশ্বাস করাইতে পারে নাই; বরকন্দাজ আবার বুঝাইয়া দিল। তখন গরীবুল্লা কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর বরকন্দাজকে কিছু না বলিয়া আবার কবর কাটিতে লাগিল। বরকন্দাজ পুনরায় কথাটার গুরুত্ব সমঝাইয়া দিল। গরীবুল্লা হাতের কোদালটা খুব উঁচাইয়া মারিয়া একটা বড় চাপ্‌ড়া চাড় দিয়া তুলিতে তুলিতে নিতান্ত শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, "তোমার বাবুকে বল গিয়া, আমি কবর কাটতেই রইলাম; যদি বাপকে কবর না দিতে পারি, তাও কবর খালি পড়ে থাকবে না, যে বাধা দিতে আসবে, তাকে কবর দিব।"

বরকন্দাজের রাগ হওয়ার কথা, কিন্তু তাহার দয়া হইল, সে নিজে গরীব বলিয়া কি না, বলিতে পারি না। সে গরীবুল্লাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বুঝাইল, "দেখ ভাই, কথাটা বাবুর কানে গেলে ত তিনি আগুন হয়ে উঠবেন; তারপর বাপের লাশ ঘরে ফেলে রেখে বাইরে একটা খুনাখুনি—সে কিন্তু বড়ই খারাপ হবে! মাঠে থৈ থৈ পানি, যাদের বাড়ী নামা জায়গায়, তারা সব লাশ ভাসিয়েই দিচ্ছে; তুমিও জানাজা প'ড়ে লাশটা ভাসিয়ে দাও, সব গোল চুকে যা'ক।" কিন্তু গরীবুল্লা বুঝে না। অবশেষে বরকন্দাজ তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "কোদাল ছাড়, বাড়ী চল।" গরীবুল্লা সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া চোখ রাঙ্গাইল, গালি দিল, রাগতস্বরে কহিল, "তুমি যদি আমার হাত ধ'রে নিরস্ত করতেই এসে থাক, তবে হুঁশিয়ার।" বরকন্দাজও তখন রাগ করিয়া রাজবাড়ী এত্তেলা দিতে চলিল; উপস্থিত হিতৈষীরা তাহাকে দুই কথা মিষ্টি বলিয়া থামাইল।

(৫)

আগেই বলিয়াছি, জমিদার সাহেবের বাড়ীতে বড় ধূমধাম, ডাক হাঁক ; অপরিচিত বিদেশী কেহ হঠাৎ দেখিলে মনে করিত, সাহেব বুঝি শাদী করিতে রওনা হইতেছেন। আদতে তিনি যাইতেছেন কলিকাতা ; কারণ স্বয়ং লাট সাহেবের দস্তখতী এক পত্রে সাহেব লাট দরবারে দাওয়াত পাইয়াছেন ; সেই ধূমেই আজ কয়দিন হইতে রাজপুরী মত্ত ; আজ তিনি রওনা হইতেছেন দাওয়াত রক্ষা করিতে। দাওয়াতে নানা আশা, 'স্বয়ং লাটসাহেবের দস্তখতী পত্রে দাওয়াত'! তারপর দাওয়াত কি শুধু দাওয়াতেই শেষ হবে, আর কিছু মিলবে না? একটা খেলাত—অন্ততঃ পক্ষে একটা 'কাইসারে হিন্দ'! এর উপর লাট সাহেবের কৌন্সিলে মেম্বর হওয়ার আশা—যেন চোখে ভাসছে যে কত বি, এ, এম, এ, পাশ করা ছোকরা চাকুরীর উমেদারীতে একটা প্রশংসাপত্র নিতে পাছে পাছে ঘুরছে! একে ত কাঞ্চীপুরের শাহ্ কেরামত আলী খাঁ সাহেবের বংশ—বাদশাহ্ শাহ্জাহানের আমলের পিতলে লিখিত সনদ এখনও বর্ত্তমান—তাহাতে যদি আবার ইংরেজ বাদশাহ্ও তেমনই সম্মান করা শুরু করিয়া দেয়, তবে বাংলাদেশের জমিদারদের মধ্যে রাজা মিঞা সাহেবের সামনে দাঁড়ায় কে? আর কেনই বা তাঁহার এ গৌরব বৃদ্ধি না হইবে? তাঁহার মত বদান্য, অতিথিবৎসল জমিদার বিশ্ববাংলায় কয়জন আছে? দারোগা হইতে শুরু করিয়া কমিশনার পর্য্যন্ত সকলের সম্মুখেই তাঁহার দুয়ার উন্মুক্ত ; এদিকে দেশে বিদেশে যেখানে দুঃখকষ্ট, সেখানেই তাঁহার দানের হস্ত প্রসারিত। বেলজিয়ান এতিম ফণ্ড, নায়েগারা প্রপাত ফণ্ড, রুষিয়ার কুকুর দৌড় ফণ্ড, কলিকাতার মশা-সংহারিণী ফণ্ড, এণ্টনোক্রণ্টিয়ার জিরাফ-রক্ষণী ফণ্ড ইত্যাদি কোন ফণ্ডই তাঁহার দানের ঋণ হইতে মুক্ত নহে।

রাজা মিঞা সাহেব রওনার আগে সবার নিকট হইতে বিদায় লইয়া পরে ব্যাঙ্গার মার কাছে বিদায় লইতে গেলেন। ব্যাঙ্গার মা এক বুড়ী, রাজা মিঞাকে কোলে কাঁকে করিয়া মানুষ করিয়াছে,—দুনিয়াতে আর তাহার কেহই নাই—এক 'কাণি' জমিও নাই। বুড়ী রাজা মিঞাকে বড় স্নেহ করে, আবার তাহার নিকট বড় আবদারও করে, সুযোগ পাইলে তিরস্কার করিতেও কসুর করে না। এই শেষ গুণের জন্য জমিদার সাহেব তাহাকে একটু খাতির করিয়াই চলিতেন। তাই, আজ কাছে যাইতেই যখন ব্যাঙ্গার মা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় এত সেজেগুজে চলেছ, বাবা?" তখন তিনি ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলেন, "কলিকাতা।" আজ বুড়ীর মন বড় খুশী ছিল; রাজা মিঞা সাহেবকে বহুমূল্য কাপড় চোপড়ে সজ্জিত দেখিয়া তাহার আনন্দের সীমা নাই। সে প্রসন্ন হাস্যে রাজা মিঞার মাথায় ও গায় আশীর্ব্বাদের হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "তা যাবে, বাবা, যাও; কিন্তু এর পরের বারের রওনা কিন্তু কলিকাতা নয়, একদম মক্কা শরিফ। তোমার বাবাকে আমার মা কোলে কাঁকে করে মানুষ করেছিল; মার বুড়া বয়সে তোমার বাবা তাকে সাথে করে মক্কা শরিফ নিয়ে গিয়েছিল। আমিও কিন্তু, বাবা, তেমনি তোমার সাথেই হজে যাবার আশাতেই এখনো বেঁচে আছি।"

(৬)

রাজা মিঞা সাহেব বজরা ছাড়িলেন। আশে পাশে পাঁচ সাতখানা নৌকায় আমলা ফয়লারা সাহেবকে বিদায় দিতে যাইতেছেন। বজরায় সাহেব, ম্যানেজার বাবু, নায়েব সাহেব, শুমার নবীশ বাবু ইত্যাদি। বজরা রাজবাড়ীর সীমা পার হইতেই রাস্তার বাঁ দিকের একটা বাড়ীতে কান্নার রোল শোনা গেল। নায়েব সাহেব যেন

অন্যমনস্কভাবে অথচ সাহেবের কানে যায়, এরূপ ভঙ্গীতে কহিল, "আহা! এ সুখের যাত্রায় আবার কান্নাকাটী কেন?"

ম্যানেজার বাবু মনিবের মঙ্গলের জন্য কম উদ্বিগ্ন হইতে পারেন না; তিনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "ওখানে কাঁদে ওটা কে রে?"

বজরার ছৈয়ের উপর হইতে জবাব দিল, "গরীবুল্লার মা।"

তিনি হুকুম দিলেন, "কে আছিস রে, দে ত মাগীর চিল্লানিটা বন্ধ করে; সময় অসময় বোঝে না, মাগী কেবল চিল্লাইতে জানে!"

এমন সময় ছৈয়ের উপর হইতে এক মাল্লা চীৎকার করিয়া উঠিল, "এই দেখুন বাবু, একটা লাশ ভেসে যাচ্ছে. এ বুঝি গরীবুল্লার বাপের লাশ—হুঁ—তাই ত!"

নায়েব সাহেব অমনি চীৎকার করিয়া কহিলেন, "ওরে, দেখিস্ যেন কিছুতেই লাশটা বজরা না ছোঁয়; ওটা সাম্নে এসে পড়ে ত চৌড দিয়ে ঘা মেরে সরিয়ে দে।"

সাহেব এতক্ষণ এ সব কথা শুনিতেছিলেন কিনা, বলা যায় না; এখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, ম্যানেজার বাবু?—গোলমাল কিসের?"

ম্যানেজার বাবু কহিলেন, "গরীবুল্লার বাপ মরেছে, তাই তার মা কাঁদছে।"

সাহেব শুনিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ।"

ম্যানেজার বাবু আবার কহিলেন, "তার লাশটা বজরার সাম্নে এসে বুঝি পড়ে, তাই নায়েব সাহেব বলছেন, লাশটা চৌড দিয়ে সরিয়ে দে!"

সাহেব কহিলেন, "যাক্ না, ও লাশের মত লাশ ভেসে, ওকে খোঁচা দেওয়ার প্রয়োজন কি?"

তখন শুমার নবীশ বাবু উচ্চ চীৎকারে কহিলেন, "ওরে; খবরদার, যেন লাশের গায় চৌড বৈঠা না লাগে।"

তাহার পর তিনি সাহেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হুজুর, আমাদের হিন্দু শাস্ত্রমতে, যাত্রা ক'রে চিতা দেখা বড় শুভ, হুজুরের যাত্রাও তেমনি শুভ হবে, তারই লক্ষণ চার দিকে দেখতে পাচ্ছি।" সাহেব মৃদু হাস্য করিলেন।

(৭)

সাহেব বাড়ী ফিরিতেছেন,—মহা ধূমধাম, শান শওকতে। সঙ্গে বজরায় জিনিষপত্র, লোকজন, খানসামা খেদমতগার, পাইক বরকন্দাজ সবই ছিল; কাজেই, তাঁহার আগমন সংবাদ বাড়ীতে পূর্ব্বাহ্লেই দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না; এতদুপরি সাহেব মনে করিলেন, "আগে সংবাদ দিয়ে খোশ-খবরের যোশটুকু নষ্ট না ক'রে একদম হঠাৎ গিয়ে বাড়ী উপস্থিত হব।" বাড়ীর কাছে বজরা যাইতেই একটা সদ্য চাষ করা শূন্য ভিটার উপর সাহেবের নজর পড়িল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ভিটাটা কা'র, ম্যানেজার বাবু?"

ম্যানেজার বাবু কহিলেন, "এই ভিটাটাই ত ছিল এতদিন গরীবুল্লার বাপের, এখন এটা হুজুরের খামার।"

"হুজুরের খামার" শব্দে যেন একটু সোয়াস্তি বোধ করিয়া তিনি সোৎসাহে কহিলেন, "ঐ ভিটায়, ম্যানেজার বাবু, একটা ভাল ডাকবাংলা করতে হবে; কারণ এখন ত সাহেব সুবা আরো বেশী আসবে, থাকার ব্যবস্থাটাও আগের চেয়ে ভাল না হ'লে চলবে কেন?"

ইতিমধ্যে সাহেবের আগমন সংবাদ নিয়ে একজন বরকন্দাজ রাজবাড়ী ছুটেছে—ইচ্ছা, উভয় পোশ খবর দিয়ে বেগম সাহেবাদের নিকট হইতে

একটা বখশিশ আদায় করা। সংবাদে কাছারী বাড়ীতে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল, সে রোল অন্দর মহলেও গিয়া পৌঁছিতে বাকী রহিল না। কোলাহল শুনিয়া ব্যাঙ্গার মা বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো, ও গো, কি হয়েছে, তাই এত গোলমাল?"

অন্দরের খানসামাদের সর্দ্দার খোতা তাহাকে ধমক দিয়া কহিল, "ইস্, এত বড় কথা, তা এখনো তোমার কানে গেল না, বড় ত সাহেবের দরদী।"

বুড়ী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি—কি হয়েছে, খোতা?"

খোতা কহিল, "শুনিস নাই বুড়ী, এখনো—সাহেব—আমাদের সাহেব—";

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বুড়ী আবার জিজ্ঞাসা করিল —"সাহেব—ওরে তাই কি?"

খোতা উত্তর দিল, "সাহেব, তাই তোমার মাথা আর মুণ্ডু, সাহেব, ছি আই, ই হয়েছেন, কলকাতার লাট সাহেবেরা আমাদের সাহেবকে ছি, আই, ই, করেছেন।" বুড়ী কিছু না বুঝিয়া হতভম্ব হইয়া রহিল; কাছে ছয় বৎসর বয়সের সাহেবজাদা দাঁড়াইয়া ছিল, সে অক্ষর তিনটা একত্র বানান করিয়া বুড়িকে বুঝাইয়া কহিল, "ছি,—আই—ই, ছাই;—বাবা ছাই হয়েছেন।" খোকামিয়ার পাণ্ডিত্যের উপর ব্যাঙ্গার মা'র অগাধ বিশ্বাস, সে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "হায়, হায়রে! আমি তখনই আমার বাছাকে বলেছিলাম রে যে বাড়ী ছেড়ে অত সহরে সহরে ফিরিস না, সেই কথা না শুনে বাছা আজ আমার ছাই হয়ে গেছে রে!! কোথায় কেমন ক'রে তার গায় আগুন ধরল রে!!!"

আষাঢ়, ১৩২৯

ঘরের ডাক*

বছির বড় আশায় বুক বাঁধিয়া আসাম গিয়াছিল। কিন্তু সেখানেও সে টিকিতে পারিল না। আয়শা দেশের জন্য হামেশা কান্নাকাটি করিত, খাওয়ায় দাওয়ায় বড় মন দিত না; এদিকে নূতন বাড়ী, তাহার খাটুনীর অন্ত ছিল না। তাহাকে জ্বরে ধরিল! অল্প অল্প জ্বর, বিছানায় শুইতে হয় না, অথচ ধীরে ধীরে জীবনী শক্তির উৎস অলক্ষ্যে শুকাইয়া যায়। বছিরের আসাম জীবনের দ্বিতীয় বর্ষের শেষভাগে সহসা একদিন আয়শার ডাক পড়িল। সে বছিরকে মাথার কাছে ডাকিয়া তাহার হাত দুইখানি নিজের দুই হাতে ধরিয়া কহিল, "বাবা, তুমি আমার কাছে কছম কর, আমাকে কবরের বিছানায় শোয়ায়েই তুমি ফতেমা ও বৌকে নিয়ে চলে যাবে। এ মরার দেশ বাবা, এর চেয়ে দেশে কামলা খেটে খাওয়া ভাল।" বছির মাতার শেষ অনুরোধে অশ্রুমাখা সম্মতি জানাইল; আয়শা চলিয়া গেল।

(২)

বছির ১৫০৲ টাকার জমি ১০০৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া আবার ছেঁড়া কাঁথা, চাটাই, লোটা ও কোদালির গাঁটরি কাঁধে দেশে ফিরিল। কিন্তু তাহার দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? তাহার পরিত্যক্ত ভিটায় নছির শেখ ঘর তুলিয়া ফেলিয়াছে, তাহার কামলা জামলা ও ছেলে সেখানে রাত্রিতে থাকে। বছির ভয়ে ভয়ে বাড়ীর আঙ্গিনায় গিয়া দাঁড়াইল। সংবাদ

* ভাই গল্পের পরিশিষ্ট

পাইয়া নছির আসিল, সে তাহাদিগকে একটি ঘর দখল করিতে দিয়া আসামের সব হাল হকিকত শুনিল এবং পরে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে এখন কি মনে ক'রে দেশে ফিরছ ?"

বছির কহিল, "ঠিক বলতে পারিনা যে এখন কি ক'রে চলবে, কিন্তু এটুকু বুঝতে পেরেছি, চাচা, যে বাংলার কৃষককে বাঁচতে হ'লে, এই বাংলা দেশে থেকেই বাঁচতে হবে. দেশ উজাড় ক'রে জঙ্গলে গিয়ে কেবল ধ্বংসের পথই পরিষ্কার করা হয়। স্কুলে পড়েছিলাম যে গারো, মান্দাইরা আগে আমাদেরই এই সব সমতল দেশে বাস করত, পরে আর্য্যদের অত্যাচারে পাহাড় জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। আসামে দেখতে পেলাম, আর্য্যেরা সে আসামে গিয়েও তাদের দখলী জঙ্গল কেটে সাফ ক'রে আবাদ শুরু করে দিচ্ছে, আর গারো মান্দাইরা গভীরতর জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে সাপ বাঘের অত্যাচারে ক্রমে ধ্বংস পাচ্ছে। বাঙ্গালী কৃষকও মহাজন জমিদারের অত্যাচারে তাদেরই মত সমতল ভূমি ছেড়ে পাহাড়ে গিয়ে জুটেছে, আবার এ গৃহতাড়িত কৃষকেরা সেখানে তাদের জঙ্গল কাটা আবাদী জমি মহাজনদের হাতে তুলে দিয়ে গভীরতর জঙ্গলের দিকে যেতে শুরু করেছে।

নছির কহিল, "তোমরা লেখা পড়া শিখেছ, অনেক বড় বড় কথা জান ; আমি মূর্খ মানুষ, এক সোজা কথা বুঝি—যদি দেশ ছেড়ে যেতেই হয়, তবে একটা দস্তুর মত লড়াই ক'রে যাব ; তার আগে এক পা পথও কোন দিকে যাব না। আর সে লড়াই বোধ হয় খুব ভাল রকমই বেধে উঠবে। সূচনা এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।" তখন নছির বছিরকে এই দুই বৎসরের ঘটনা সবিস্তার যাহা কহিল তাহার মর্ম্ম এই—বছির দেশ ছাড়িয়া যাওয়ার পরই কানাই সরকার নছিরের পাছে লাগিয়াছে,

জমিদার কাছারীতে কিছু 'তদ্বির' করিয়া বছিরের ভিটা জমি সে উচ্চ নজরে পত্তন নেওয়ার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু ইতিমধ্যে নছির সে জমি দস্তুরমত দখল করিয়া বসায় যখন তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, তখন সে থানায় কিছু 'তদ্বির' করিয়া তাহার উপর দুই নম্বর ফৌজদারী চালাইয়াছে। কিন্তু নছিরের সৌভাগ্যক্রমে চোরেরা পুলিশের রুলের গুতায় প্রথম প্রথম নছিরকে তাহাদের থলিয়াদার বলিয়া প্রকাশ করিলেও পরে হাকিমের নিকট তাহা অস্বীকার করায় ফৌজদারী ফাঁসিয়া গিয়াছে। নছিরের দুইজন আত্মীয় কানাই সরকারের খাতক; কানাই সরকার এখন তাহাদের ভিটায় ঘুঘু চরাইবার মতলবে আছে। এদিকে জমিদার সরকারেও 'তদ্বির' পূরা দমেই চলিতেছে, যাহাতে নছিরকে 'বিদ্রোহী' প্রজা বলে খাড়া করা যায়।

বছির সব কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে এখন কি করতে চাও চাচা?

নছির কহিল, "লড়ব। তবে একাজে আমি তোমাকে সঙ্গী চাই; এই জালেমের জুলুম নিবারণ করতে তোমার শিক্ষা-শক্তির প্রথম পরীক্ষা হোক্।"

বছির কহিল, "করব চাচা, জান দিয়ে হলেও সে সাহায্য আমি করব।"

ইহার পর বছির নছিরকে জমি বেচা সেই ফেরত একশ টাকা দিতে গেল; নছির বাধা দিয়া কহিল, "না বছির, ও টাকা এখন তোমার কাছেই থাক্, এ বাড়ী তোমারই, নিরাপদে এখানে থাক, আমার চাকর বাকর ছেলে আজই চলে যাবে। তুমি আগামী হাটে দুইটা হালের গরু কিনে চাষ আবাদ শুরু করে দাও, বর্গা জমিতে যাতে তোমার পোষায়, আমি সে বন্দোবস্ত ক'রে দিব।"

বছির কহিল, "তবে আমি আর এক প্রস্তাব করি চাচা; চাষ আবাদ সম্প্রতি বন্ধ রেখে, ঐ একশ' টাকা পুঁজীতে তেল, তাঁমাক, লবণ, মরিচের একটা দোকান ক'রে দেখি।"

নছির, "কিন্তু পারবে না, আবার ঐ কানাই সরকার তোমাকে কোন-ঠেসা করবে, তার পুঁজী দশ হাজার টাকা, তোমার পুঁজী একশ' অন্য সাহা মহাজনও আছে।"

বছির—"কেন পারব না চাচা? আমার ত খুব বিশ্বাস হয় আমি পারব। কানাই সরকারের যেমন দশ হাজার টাকার মূলধন, তেমনি তার দশ জন বেতন-ভুক চাকরও আছে; তার চাকররা সুযোগ পেলেই কিছু চুরি চামারি করবে; তার জিনিষ আসতে ঘোড়া ভাড়া, গাড়ী ভাড়া লাগে। আমার কিন্তু এসব কোন খরচই হবে না। আমি নিজে কাজ করব, নিজে মাথায় ব'য়ে গোলাগঞ্জ হ'তে জিনিষ আনব, আবার নিজে মাথায় বয়েই হাটে বাজারে দোকান নিয়ে যাব। তারপর ধর খরিদ্দারের কথা, তারাত বার আনাই আমার জাত ভাই কৃষক; আমি যদি তাদিগকে উচিত দামে জিনিষ দেই ও সদ্ব্যবহার দেখাই তবে তারা আমার দোকান ছেড়ে কানাই সরকারের দোকানে যাবে কেন? কানাই সরকারের টাকা আছে সে সেই বলে কুঁদে বেড়ায়, আমাদেরো বুকের বল, গায়ের বল, লোক বল আছে, আমরা সেগুলির ব্যবহার না করব কেন?"

নছির পরম উৎসাহিত হইয়া কহিল, "এইত বাপু, এই জন্যই ত বলি, তোমরা লেখা পড়া জানা লোক সব দেশ ছেড়ে চ'লে যাওয়াতেই আমরা মূর্খ চাষারা এমন সাঁতারে প'ড়েছি। এই যে এখন এমন

সুন্দর বুদ্ধিটা দিলে আমার মাথায় ত এ ককৃখনো ঢুকে নাই; ঢুকতও না; তুমি এখানে না থাকলে কে এ কথাটা বুঝিয়ে দিত?"

নছির ও বছিরের প্রাণপণ চেষ্টায় বছিরের দোকান ক্রমেই বেশ জমকিয়া উঠিল বটে, কিন্তু কানাই সরকার তাহার খাতকদের সাহায্যে গ্রামে দলাদলির সৃষ্টি করিয়া নছিরকে জব্দ করিতে লাগিল এবং তাহাতে আংশিক কৃতকার্য্যও হইল। অবশেষে অতি চালাকের গলায় দড়ি পড়িল। সে গ্রামের নেওয়াজ মণ্ডলকে নছিরের প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তুলিয়াছিল। বছির ইতিমধ্যে বাজারে ঘর করিয়া দোকান বসাইয়াছে। কানাইয়ের দোকানে কৃষক খরিদ্দাররা বসিতে পায় চট, ছালা, মাতব্বররা পায় বড় জোর ভাঙ্গা নৌকার আধ পচা সছিদ্র তক্তার তৈরী একখানা বেঞ্চি। ফরাসের কাছে কৃষক খরিদ্দার কেহ ঘেঁসিতেও পায় না; আর তামাকের জন্য পায় তাহারা বিড়াল-মাথা-শুকনা একটা হুঁকা; কিন্তু বছির তাহাদিগকে সযত্নে ফরাসে বসাইয়া পানি ভরা সুন্দর হুঁকা টানিতে দেয়। কৃষকের দোকান বাজারে না থাকায় এ তফাৎটা কৃষক খরিদ্দারেরা এতদিন লক্ষ্য করে নাই। এইবার তাহাদের অনেকে বছিরের দোকানের দিকে ঝুঁকিল। কানাই সরকার টের পাইয়া তাড়াতাড়ি নেওয়াজ মণ্ডলকে ডাকিয়া নিজ ফরাসে বসাইল ও নূতন একটা তাজা হুঁকার ব্যবস্থা করিল; নেওয়াজের দল খুশী হইয়া কানাইয়ের সঙ্গে ফুর্ত্তি করিতে লাগিল। কিন্তু একদিন নেওয়াজ মণ্ডল কানাইয়ের ফরাস হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিতে আসিতে শুনিল, "ওরে কেষ্টা, এই ভদ্রলোকের হুঁকার জলটা ফেলে দেত, নছরা ব্যাটার সাথে ফছাদ করে এখন এই সব চাষা মুচুলমান ব্যাটাদিগকে ফরাসে বসতে দিয়ে জাতের গলায় দড়ি দেওয়া হচ্ছে।"

নেওয়াজ বাড়ী ফিরিয়াই নছিরের নিকট গেল ও কহিল, "ভাই আমরা সবাই চাষা, চাষায় চাষায় মান সম্মান নিয়ে থাকি, ব্যাটা ভদ্রলোকের কাছে আর যাব না।"

কানাইয়ের ঘরের বহু গ্রাহক কমিয়া গেল। কিন্তু কানাই দমিবার লোক নহে। গ্রামে বহুকাল হইতে গো কোরবাণী হয়, তাহাতে কানাই সরকারের কোনও দিন কোন আপত্তি হয় নাই, এবার সহসা তাহার গোভক্তি তীব্র হইয়া জাগিয়া উঠিল; সে গ্রামের আট আনার মালিক শশীবাবুকে গিয়া সংবাদ দিল, তিনি একটু হুকুম দিলেই এ নৃশংস 'মাতৃ-হত্যা' নিবারণ হয়। একটা হুকুম মাত্র দিয়ে, গো-মাতা রক্ষার পুণ্য হইতে বঞ্চিত হওয়ার মত দুর্ব্বুদ্ধি শশীবাবুর কোনকালেই ছিল না। সুতরাং তিনি নিষেধাজ্ঞা দিয়া বসিলেন। কয়েকজন হিন্দু লাঠিয়াল কোরবাণীর গরু ছিনাইয়া লইতে আসিলে দাঙ্গা হইল। কোর্টে ফৌজদারি উঠিল। নছির, বছির, নেওয়াজ সবাই আসামী পড়িল। শশীবাবু মোকদ্দমায় টাকা ছড়াইতে লাগিলেন; মুছলমানরা গরীব, তাহারা অন্যতম জমিদার সৈয়দ সাহেবের দ্বারস্থ হইল। সৈয়দ সাহেব নিতান্ত গম্ভীরভাবে কহিলেন, "দেখ বাপু, হিন্দু মুছলমান সবাই আমার প্রজা, আর তা ছাড়া আমি হিন্দু মুছলমানের নেতা, এ সাম্প্রদায়িক ঝগড়ায় নামলে হিন্দু ভ্রাতারা কি মনে করবেন?" তাহারা নিরাশ হৃদয়ে ফিরিয়া আসিল। মোকদ্দমা চলিল। কিন্তু উকীল মোক্তার কোথায়? শশীবাবুর পক্ষে নলিনী বাবু ও কৈলাশ বাবু উকীল, এবং নরেন্দ্র নাথ ও শিবচন্দ্র মোক্তার দাঁড়াইলেন। অবশেষে অন্য মহকুমা হইতে একজন মুছলমান উকীল আনিয়া কাজ চালান হইল। আসামীদের অনেকের জেল হইল, নছির, বছির ও নেওয়াজ বাঁচিল।

আশেপাশের গ্রামের প্রজারা এই মোকদ্দমায় চাঁদা তুলিয়া আসামীদের সাহায্য করিয়াছিল। মোকদ্দমার পর তাহারা এক রায়ত সভা করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, "কানাই সরকারের দোকানে তাহারা কেহ সদায় করিবে না, তাহার নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিবে না বা তাহার বাড়ীতে কেহ চাঁকর খাটিবে না।" কানাই সরকারের চাকররা শর্ত্ত দিল, তাহাদের বর্ত্তমান বৎসরের কাজ শেষ হইলেই আর তাহারা তাহার বাড়ীতে খাটিবে না। বর্গাদার বর্গা জমি ছাড়িয়া দিল। কানাই সদর্পে কহিল, "মরবে বাপু, তোমরাই ভাতের অভাবে, আমার গোলায় যে ধান চাল আছে তাতে পাঁচ বৎসর আমার অনায়াসে চলবে।" কৃষকরা তাহার দোকান লুট করিবে অজুহাতে শান্তি রক্ষা করিবার জন্য সে বাজারে একজন কনষ্টবল আমদানী করিল; ঘরের সামনে লাল পাগড়ী দেখিয়া খরিদ্দারেরা তাহার দোকান আরও ছাড়িল। দোকানে জিনিষ আছে, চাকর আছে কিন্তু খরিদ্দার নাই। বছিরের দোকান খুব তাড়াতাড়ি বড় হইয়া উঠিল। দেখাদেখি আরও কয়েকজন কৃষক দোকান খুলিয়া বসিল। কানাই বেপরোয়া রহিল। উকিল মোক্তার চারিটির পশার আংশিক কমিয়া গেল, তাহারাও বেপরোয়া রহিল। কৃষি-ব্যাঙ্ক গ্রামে খুলিতে কিন্তু বড় বেগ পাইতে হইল। গ্রামবাসীদের দরখাস্ত পাইয়াই ব্যাঙ্কের যে কর্ম্মচারী পরিদর্শনে আসিলেন, কানাই সরকার তাঁহাকে পাঁঠা মারিয়া খাওয়াইল ও আর কি করিল তাহা বলা যায় না, কিন্তু তিনি মহকুমায় ফিরিয়া রিপোর্ট দিলেন, "লোক ভারি গরীব, জমি জিরাত নাই, যা আছে ঋণে ডুবা, লোক বড় ফছাদী, কাজেই ব্যাঙ্ক না দেওয়া বাঞ্ছনীয়।" তাঁহার কথা বেদবাক্য জ্ঞানে ব্যাঙ্কের কর্ত্তারা নীরব রহিলেন। গ্রাম-

বাসীরা আবার দরখাস্ত করিল; আবার ঐ অবস্থাই হইল। ওদিকে মহকুমার রুষ্ট উকিল মোক্তার চতুষ্টয় ব্যাঙ্ক যাহাতে না হয় তাহার জন্য চেষ্টার কোনও ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু ব্যাঙ্কের একজন যুবক পরিদর্শকের পরামর্শে বহু গ্রামের লোকে নাম দস্তখত করিয়া কৃষি-ব্যাঙ্কের রেজিষ্ট্রারকে জানাইলে তিনি স্বয়ং বিশ্বাসী লোক পাঠাইয়া পরিদর্শন করতঃ ব্যাঙ্ক মঞ্জুর করিতে আদেশ দিলেন। ব্যাঙ্ক হইল; নূতন কাজ সব ব্যাঙ্ক হইতে করা হইতে লাগিল। কানাই সরকারের মহাজনী কারবারের নূতন দলিল লেখা একরূপ বন্ধ হইল।

আবার রায়ত সভা ডাকিয়া সকলে প্রস্তাব করিল, "আয় বাড়ান ও ব্যয় কমান ভিন্ন কৃষকের রক্ষার উপায় নাই। মামলা মোকদ্দমা আমরা আপোষে মীমাংসা করব। বিয়া; আকিকা, ফাতেহা, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতির অপব্যয় বন্ধ করব। যারা টাকা কর্জ্জ ক'রে লোক খাওয়ায়, তাদের সে দাওয়াতে আমরা যাব না। সুস্থদেহ অলস ভিখারী ভিখারিণীর ভিক্ষা বন্ধ কর। ঘোড়া গরু সাবধান কর, খুরিখন্দ হোক, ব্যাঙ্কের বাবুদের পরামর্শ নিয়ে নূতন নূতন শস্যের বীজ ও সার ব্যাঙ্কের মারফৎ আমদানী করা হোক। দেশে লাক্ষা, রেশম, আক, এ সবের কিছু কিছু আবাদ ব্যাঙ্কের সাহায্যে শুরু করা হোক। গ্রামের পচা পগারগুলি কেটে ছেটে পুকুর কর, বাড়ী উঁচু হবে, ম্যালেরিয়া কমবে, মাছ পুষবার ও গোছলের জায়গা হবে। বাড়ীর চারিদিকে আগাছার জঙ্গল কেটে মূল্যবান গাছের চারা লাগাও; তরি-তরকারী পান সুপারীর আবাদ বৃদ্ধি কর। বছরের বার মাসের মধ্যে ছয় মাস মাত্র কৃষককে কৃষিকাজ করতে হয়; বাকী ছয় মাস মাঠে মারা

যায়; এই ছয় মাসকে কাজে লাগাও। জাঁতায় ডাল ভাঙ্গ; মাছ ধরবার জাল, পাটের দড়ি, সতরঞ্চি তৈরী কর; ছুতার মিস্ত্রীর কাজ বা অন্যান্য শিল্প কাজ যে যা পার শুরু কর। হাঁস মুরগী পোষ, ডিম বিক্রয় করেও বাজে খরচের পয়সাটা জোটান যাবে।

প্রস্তাবমত কাজ শুরু হইল। আলগা ঘোড়া গরুর জ্বালায় খুরিখন্দ আর আর বছর যাহারা কিছু পায় না, এবার তাহারা অনেক পাইল; কানাই সরকারের বর্গা জমি আবাদ না করার আংশিক ক্ষতি পূরণ হইল।

তাহাদের চেষ্টার ফল দেখিয়া কৃষকরা পরম উৎসাহিত হইয়া দ্বিগুণ বেগে প্রস্তাব মোতাবেক অন্যান্য কাজও করিতে লাগিল। এক বৎসরের মধ্যে দেখা গেল, গ্রামকে গ্রামের চেহারা বদলাইতে শুরু করিয়াছে; ক্ষেত ভরা শস্য, পাহারা নাই অথচ ক্ষেতের একটি গাছও গরু ঘোড়ায় নষ্ট করে নাই, কুটির শিল্পেও অনেকে দু'পয়সা পাইয়াছে; লোকের মুখে চোখে একটা আনন্দ, উৎসাহ ও জীবনের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু কানাই সরকার বসিয়া নাই। গ্রামের কয়েকজন লোক জমি পত্তনের জন্য সৈয়দ সাহেবের কাছারীতে গেল। কাছারীতে কানাইয়ের তদ্বিরের ফলে ম্যানেজার বাবু কহিয়া বসিলেন, "যদি তোমরা বছিরের ভিটা জমি দখল করে দিতে পার তবে একসঙ্গে সব জমির পত্তন পাবে, নইলে এক 'পাখী'ও পত্তন পাবে না।" এ প্রস্তাব তাহারা ঝাড়া অস্বীকার করিল। ম্যানেজার তাহাদের একজনকে জুতা পেটা করিলেন, অপর একজনকে একদিন মালখানায় বন্ধ রাখিয়া বেয়াদবীর জন্য দশ টাকা জরিমানা আদায় করিয়া লইলেন। এ সংবাদে সমস্ত প্রজারা ক্ষেপিয়া গিয়া

রায়ত সভা ডাকিল এবং সভায় স্থির হইল, আর তাহারা জমিদারের ডাকে জুঁতা পেটা হওয়ার জন্য কাছারীতে যাইবে না। অতঃপর কাছারী হইতে তলব আসে; কিন্তু কেহ হাজির হয় না। কথা সৈয়দ সাহেবের কানে গেল। তিনি নিজে তলব দিলেন, তবু কেহ গেল না। কানাই সরকার কাঁদিয়া গিয়া সৈয়দ সাহেবের নিকট গলায় কাপড় জড়াইয়া করজোড়ে কহিল, ''এই সব অবাধ্য বিদ্রোহী প্রজারা হুজুরের গোলাম আমার উপর নানা অত্যাচার করেছে শুধু এই জন্য যে আমি হুজুরের অবাধ্য হয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিই নাই।"

সৈয়দ সাহেব তাহাকে ধমক দিয়া সরাইয়া দিয়া পুত্রের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বাবা, তুমি কি এক পাগলামী করেছিলে সেজন্য গবর্ণমেণ্ট ক্ষ্যাপা, তাহার উপর আমার বাড়ীর চারি পার্শ্বের প্রজাগুলাকে বিদ্রোহী করে তুললে, আমরা কি তবে ঐ কানাই সরকারকে নিয়ে থাকব ?" সৈয়দ সাহেব স্বয়ং পাল্কী করিয়া গ্রামে আসিয়া প্রজাগণকে ডাকাইলেন।

প্রজারা কহিল, "হুজুর ধর্ম্মবতার, আমরা কাছারীতে গিয়া কুকুর বিড়ালের মত ব্যবহার পাই আর জুতা পেটা হই, এ অবস্থায় আর আমরা হুজুরের কাছারীতে স্বেচ্ছায় যাই কি করে ?"

সৈয়দ সাহেব আশ্বাস দিলেন, অমন জুলুম অপমান আর হবে না।

প্রজারা আবার কহিল, "হুজুর মা বাপ, আমরা হুজুরের ছেলে, সুখ দুঃখের সঙ্গী; হুজুরের নিকট ছেলের চেয়ে কি চাকরের কদর বেশী ? তা যদি না হয় তবে আমরা প্রার্থনা করি, বিদেশ বিভুঁই হ'তে কতকগুলি চাকর টেনে এনে কাছারী না ভ'রে আমাদের প্রজাদের মধ্য হ'তে উপযুক্ত লোক আমলা নিযুক্ত করুন। তারা হুজুরের মঙ্গল ও প্রজার দুঃখ বেদনা উভয়ই বুঝবে।"

সৈয়দ সাহেব অতঃপর তাহাই করিবেন, স্বীকার করিলেন। বসিবার একটা ভাল ব্যবস্থার কথাও স্বীকার করিলেন। তাঁহার সঙ্গে গোল মিটিয়া গেল। আবার কোরবাণী আসিল। কানাই সরকার এবার গিয়া শশীবাবুর চরণে কাঁদিয়া পড়িল, "ধর্ম্মাবতার, এবারও বুঝি 'গো-মাতার' হত্যায় কর্ত্তার রাজ্য কলুষিত হয়?"

শশীবাবু হাঁকিলেন, "এই কে আছিস্ রে, দে ত এই কোটনা ব্যাটাকে ঘাড় ধ'রে বের ক'রে। যে ব্যাটা গোহত্যা করবে তাকে পাঁচ জুতা, আর যে ব্যাটা খুঁজে খুঁজে সেই খবর দিতে আসবে, তাকে পঞ্চাশ জুতা।"

ইহার কয়েকদিন পরেই কৈলাশবাবু ও কানাই সরকার আসিয়া বছির, নছির ও নেওয়াজকে ডাকিয়া বলিল, "ভাই, আমরা এক দেশের লোক, এক মায়ের সন্তান, আমাদের কি অধিক দিন ঠাঁই, ঠাঁই সাজে?"

বছির বলিল, "আমরা আমাদের রায়ত সভা ডেকে সকলের মত জিজ্ঞাসা ক'রে এর উত্তর দিব।"

তাহারা চলিয়া গেলে নছির কহিল, "দেখ বাপু, এ কপট ভাইদিগকে সাত ঘাটের পানি খাওয়ানর আগে কিন্তু কোন আপোষ নাই।"

বছির কহিল, "না, চাচা, আমরা কিছু জুলুম করব না। আমাদের দোকান পাট, গো কোরবাণী, ব্যাঙ্ক স্থাপন, রায়ত সভা এগুলি সব সঙ্গত কাজ, এগুলি আমাদের থাকবে। তবে সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে যে যে শর্ত্তে আপোষ হয়েছে, সেই শর্ত্তে শশী বাবুর সঙ্গে আপোষ চাই। কানাই সরকারের দোকানে সকলে জিনিষ খরিদ করুক, আমাদের কিছু আপত্তি নাই; কৈলাশবাবুকে আমরা মোকদ্দমা দিতেও নিষেধ করব না। ওরা ঘা দিয়া আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে,

সেজন্য আমরা বরং কৃতজ্ঞ! আর এই যে আজকের 'ভাই' ডাক, এ আগেকার মত সম্পূর্ণ কৃত্রিম নয়। কারণ আজ এরা আমাদের বল দেখেছে; সবলকে সবাই ভাই বলতে চায়, দুর্ব্বলকে কেউ জোর করে ভাই বলতে গেলেও তা উপহাসের মতই কানে বেজে ওঠে।"

পরহেজগার

মক্তবের ছাত্র আবদুল হক পাশের ঘরে বসিয়া প্রথমে মাথা ঘুরাইতে ঘুরাইতে, পরে ঝিমাইতে ঝিমাতে ক্রমাগত আবৃত্তি করিয়া যাইতেছিল,—"পরহেজগার অর্থ ধর্ম্ম-ভীরু, পরহেজগার অর্থ ধর্ম্ম-ভীরু…উ…উ…"

ডাক দিলাম—'আবদুল হক'……?

আবদুল হক ধড়ফড়াইয়া উঠিয়া আওয়াজ দিল—"উ…উ.. আ… আ…পরহেজগার, পরহেজগার. পরহেজগার…"

ফের ডাক দিয়া বলিলাম, "পরহেজগার কি রে?"

উত্তব দিল—"এই—এই—এই—ভীরু, ভীরু, ভীরু…পরহেজগার অর্থ ভীরু… ।"

এবার ধমক দিলাম, "বই দেখে পড না ।"

একটু বিলম্বে উত্তর পাইলাম—"দোয়াতটা কেমন ক'রে উল্টে গিয়ে ধর্ম্মের উপর কালি পড়ে গেছে, শুধু 'ভীরু' টুকু বাকী আছে ।"

হঠাৎ মনে হইল, সত্যই কি পবহেজগারের ধর্ম্মে কালি পড়ে গেল, সে এখন শুধু ভীরু ?

কয়েকজন পরহেজগারের কথা মনে পড়িল।

(১)

তখন পড়ি। বর্ষাকাল। শুক্রবার। মছজিদে গিয়া একজন নূতন লোক চোখে পড়িল,—শুনিলাম তিনি মদীনা হইতে আসিয়াছেন; বিশ্বাস হইল। বাস্তবিক তাঁহার মুণ্ডিত মস্তক, চতুর্ভুজ আকৃতি, জরীর পাগড়ী, ছুরমা-আঁকা চোখ. তলোয়ারের ধারের মত অতি সূক্ষ্ম গুম্ফ-রেখা,

মাথা হইতে ঝুলান বিস্তীর্ণ রেশমি রুমাল, অতি লম্বা, অতি জমকাল লেবাছ, গর্ব্বিত গতি, গম্ভীর বদন, প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক কটাক্ষ দেখিয়া যে কেহ মনে করিতে পারিত, ইনি হয় ত আমীর ফয়ছলের সাক্ষাৎ বৈমাত্রেয় ভাই; দুনিয়ার দাগায় দিল-রঞ্জিদা হইয়া আখেরের ছওদা হাছেল করিতে এই দারুল হরবে তবলীগে বাহির হইয়াছেন। নামাজ অন্তে হোটেলে ফিরিলাম।

কিছুক্ষণ পরে একটি বিজ্ঞাপন হাতে পড়িল; তাহার মর্ম্ম এই :—পীরানে পীর, আমীরুল মোহাদ্দেছিন, রঈছুল মোফাচ্ছেরীন, ফখরুল ওয়ায়েজীন, হাজী, পুর-নুর, হজরত শা......কাকী ছাহেব মেহেরবানী করিয়া এতদঞ্চলে তশরীফ আনিয়াছেন। যে যেখানে যে অবস্থায় আছ, অবিলম্বে তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া তাঁহার সঙ্গে যে সব তবরুরোক আছে, তাহার জিয়ারত করিয়া আখেরাতের নাজাত হাছেলের রাস্তা খোলাছা কর। খবরদার! এই তবরুরোক যে অবিশ্বাস করিবে, সে কাফের মরদুদ হইবে।

"কাফের—মরদুদ।" মনটা ছঁাৎ করিয়া উঠিল। বিজ্ঞাপন বিলি-কর্ত্তা আরও জানাইল,—নামাজ বাদ শাহ্ ছাহেব তবরুরোক টেবিলের উপর রাখিয়া সবাইকে দেখাইয়াছেন; তাহার পর সেই টেবিল মছজিদের ইমাম ছাহেবের মাথায় দিয়া নিজ নৌকায় নিয়াছেন; যে-সে তবরুরোকের টেবিল ছুঁইতে পারে না; ইমাম ছাহেব ছুঁইতে পারেন বটে, তবে হাত দিয়া ছুঁইলে বেয়াদবী হয়, তাই তাঁহাকে টেবিলের নীচে গিয়া বসিয়া টেবিল মাথায় লইয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে।

আমাদেরই ইমামের মাথায় টেবিল!—তাও আবার টেবিলের নীচে গিয়া তবে মাথায় !!

পাশের ঘরে গিয়া মাষ্টার সাহেবকে সব কথা বলিতেই তিনি উঠিয়া বলিলেন, "চল যাই।" মৌলভী সাহেবও সঙ্গে চলিলেন।

গিয়া দেখিলাম, গ্রামের কয়েকজন মুছুল্লীকে শাহ্ সাহেবের জনৈক চেলা মদীনার রওজা মোবারকের মোমবাতি দেখাইতেছেন ও মুছুল্লীরা তাহা টুকরা টুকরা করিয়া খরিদ করিতেছেন। রওজা মোবারকের মোমবাতির নাজাত-দান শক্তিতে বিশ্বাস না করিলে কাফের মরদুদ হইতে হয়, ইহা কোরান, হাদিছ বা ফেকার কোথায় আছে, মৌলভী সাহেব শাহ্ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শাহ্ সাহেব কখনও আমতা-আমতা করিয়া, কখনও ধমক দিয়া আসল কথা এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন। সুতরাং আলোচনা অধিকক্ষণ নরম রহিল না।

এমন সময়ে সেখানে যিনি আসিলেন, তাঁহাকে শুধু আমাদের অঞ্চলের লোক নয়, বাহিরের লোকেও মনে-প্রাণে গভীর ভক্তি করিয়া থাকে— তাঁহার চির-নির্ম্মল চরিত্র, তাঁহার অচল ধর্ম্মনিষ্ঠা, তাঁহার মধুর অমায়িক ব্যবহার, তাঁহার সুদৃঢ় সত্য প্রিয়তার জন্য। আমরা এখানে তাঁহাকে ক সাহেব 'বলিব। আমরা ক সাহেবকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিলাম। তিনি উপস্থিত আলোচনার কিঞ্চিৎ শুনিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মৌলভী সাহেব তাঁহাকে একটু অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করায় তিনি কানে-কানে বলিলেন, "না ভাই, আমি যাই, কার মধ্যে কি আছে, কে জানে?" উপস্থিত আর নৌকা না থাকায় আমি শাহ্ সাহেবের নৌকায় তাঁহাকে পার করিয়া দিতে ইচ্ছা করায় তিনি দুই হাতে মানা করিয়া বলিলেন, "ঐ মোমবাতি ত নৌকায় আরো আছে; আমি ও তবরুরোকের নৌকায় পা দিব না।" তিনি জুতা-মোজা খুলিয়া, পা-জামা টানিয়া পানিতে হাঁটিয়া পার হইয়া গেলেন।

বিজ্ঞাপন সংশোধনের প্রতিজ্ঞা করিয়া শাহ্ সাহেব তখনই নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। আমাদের অনুপস্থিতিতে লোকে বলাবলি করিল,—"একটা কামেল লোক এসেছিল, দুষ্টেরা টিকতে দিল না। মৌলভী সাহেব কোরান-হাদীছে হাজার লায়েক হউন না কেন, পরহেজগার ত নন; পরহেজগার যিনি তিনি এ সব বাজে আলাপের আঁচ পেয়ে আগেই চলে গেলেন।"

(২)

গ্রামে হাজার দুই পরিমাণ মুসলমান বাসিন্দা। নানা কারণে অনেক-দিন হইতে গ্রামটির সঙ্গে পরিচয়। গ্রামে ঝগড়া-বিবাদ আদৌ ছিল না, এমন বলা যায় না; গরু-বাছুরে ক্ষেত খাওয়া লইয়া বচসা শুনিয়াছি; জুমার নামাজ বাদ মুছুল্লীদিগকে দল বাঁধিয়া গিয়া মাঠে আইল ভাঙ্গার কলহ মিটাইতে দেখিয়াছি, তার বেশী কিছু কখনও নজরে পড়ে নাই, কানেও আসে নাই।

সেই গ্রামে অকস্মাৎ খুনাখুনি হইয়া গেল—শুনিয়া গেলাম। সংবাদ লইয়া যাহা জানিলাম, তাহার মর্ম্ম এই—প্রায় এক বৎসর কাল আগে গ্রামের দক্ষিণ-পাড়ার মোড়ল বাড়ীতে এক পেশোয়ারী মওলানা সাহেব আসিয়া ওঠেন এবং পাড়ার লোকের নামাজ, রোজা, অজু, গোছল বিষয়ে বহুত গলত তাঁহার নজরে পড়ে। তিনি সে সবের সংশোধন করতঃ চুল পরিমাণ-মত লম্বা রাখিয়া কিরূপে ছোন্নত বাবরীর ছওয়াব হাছেল করিতে হয়, মিলাদ মহ্‌ফেল করা কি ভীষণ হারাম, ইত্যাদি শরীয়তের মছলা মছায়েল বিশদভাবে বুঝাইয়া, হক-রাস্তা বাৎলাইয়া দিয়া যান। উত্তর-পাড়ার মোড়ল মওলানা সাহেবকে দাওয়াত করিয়াছিলেন; কিন্তু

দক্ষিণ-পাড়ার মোড়লের বিবির আগ্রহাতিশয্যে মওলানা সাহেব যে কয়দিন গ্রামে ছিলেন, সে কয়দিন সে বাড়ী ছাড়িতে পারেন নাই। ফলে উত্তর-পাড়া সংশোধিত মছলা মছায়েল গ্রহণ করার সুযোগ পায় নাই। ইহার মাস ছয় পরে এক বোগদাদী মওলানা সাহেবকে পথ হইতে দাওয়াত করিয়া উত্তর-পাড়ার মোড়ল নিজ বাড়ীতে আনেন এবং পেশোয়ারী মওলানার চুল সংশোধন ও মৌলুদ হারাম করার কথা তাঁহাকে বলেন। শরীয়তের উপর এইরূপ দস্ত-আন্দাজী করার বেয়াদবী মওলানা সাহেব বরদাস্ত করিতে না পারিয়া উত্তর-পাড়ার সবাইকে ডাকিয়া আরবী জবানে হাদীছ, কোরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, দক্ষিণ-পাড়ার সব লোক কাফের, লা-মোজহাবী, মরতুদ হইয়া গিয়াছে; তাদের সঙ্গে নামাজ পড়া, খাওয়া-দাওয়া, বিবাহ-শাদী এমন কি উঠা-বসা করা পর্য্যন্ত হারাম। মোরতেদ, কাফের, লা-মোজহাবীরা জুমা-ঘরে নামাজ পড়ায় উহা এতকাল নাপাক হইয়া রহিয়াছিল; মওলানা সাহেব তৎক্ষণাৎ আদেশ দিয়া স্বয়ং সামনে হাজির থাকিয়া উহা ধোয়াইয়া, মুছাইয়া পাক করিয়া দিয়া যান। ইহার পর দক্ষিণ-পাড়ায় একটি জুমা-ঘরের পত্তন হয়; গ্রামের ধর্ম্মভাবও বেশ সতেজ হইয়া উঠে।

দক্ষিণ-পাড়ার মুছুল্লীরা উত্তর পাড়াকে বলে, "তোমরা নামাজ পড়, না মাথা দিয়া ধান ভান, আমরা ত ভাই, বুঝি না।" উত্তর-পাড়ার মুছুল্লীরা দক্ষিণ-পাড়াকে বলে, "তোমরা নামাজ পড়, না ছেজদায় গিয়ে আল্লাকে ফাঁকি দিয়ে ঘুমিয়ে নেও, আমরা ত ভাই বুঝি না।" কথা ক্রমে গরম হইয়া উঠে। শরীয়তের এই সব সূক্ষ্ম প্রশ্নের মীমাংসার জন্য শাগরিদানের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া বিশেষতঃ পার্শ্ববর্ত্তী গোমরাহ্‌দের জেহালত হইতে নিজ মুরিদানের ইমানে যাহাতে কোনরূপ

খলল না আসে, তৎসম্বন্ধে হুশিয়ার করিবার জন্য পেশোয়ারী, বোগদাদী উভয় মৌলানা সাহেবান কয়েকবার ঘন-ঘন আগমন করেন, ক্রমে উভয় পাড়ায় জেহাদী যোশের সৃষ্টি ও পুষ্টি হয়, ফলে উল্লিখিত দাঙ্গায় উভয় পক্ষে আজ মোট ৭ জন জখম হইয়াছে; তার মধ্যে দুইজনের অবস্থা সঙ্গীন। উভয় পক্ষ হইতে আহতগণকে লইয়া মহকুমা হাসপাতালে গিয়াছে, কয়েকজন থানায় গিয়াছে, আর যাহারা বাড়ীতে আছে, তাহারা বাঁশ-ঝাড় উজাড় করিয়া লাঠি, শড়কি, বল্লম তৈরীতে লাগিয়া গিয়াছে।

গ্রামের খ মুনশীর কথা মনে পড়িল। ৭ বৎসর আগের কথাও স্পষ্ট মনে আছে, এই খ মুনশী নিজের ক্ষুর-ধার বুদ্ধি, অসামান্য বাক্‌পটুতা, দুর্জ্জয় সাহস ও অক্লান্ত কর্ম্মশক্তির প্রভাবে সমস্ত গ্রামখানিকে অঙ্গুলি হেলনে উঠাইয়াছে বসাইয়াছে। সে সাধ্যপক্ষে ঝগড়া গ্রামেই আপোষ মীমাংসা করিয়া দিয়াছে। যখন পক্ষ বিশেষ তাহার সালিশ না মানিয়া বেয়াড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে তখন তাহার প্রতিপক্ষের পক্ষ অবলম্বন করিয়া আদালতের সাহায্যে তাহাকে শায়েস্তা করিয়াছে। সে কখনো কখনো গ্রামের লোকের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া রোয়া না খাইয়াছে এমনও বলা যায় না। কিন্তু তাহার গ্রামের লোককে আশে পাশের দশ গ্রামের কোন লোক হাটে মাঠে ঘাটে খালে বিলে কোন কটু কথা বলিয়া যাইবে, বা কোন বিদেশী মৌলভী মৌলানা আসিয়া নামাজ না পড়ার জন্য তাহার কোন গ্রামবাসীকে জুতা পেটা করিয়া গলায় মরা গরুর হাড্ডির মালা পরাইয়া দিবে, কিংবা গ্রামের লোক নিজেদের মধ্যে মারামারি করিবে সে কিছুতেই তাহা সহ্য করে নাই।

ছুটিয়া খ মুনশীর বাড়ী গেলাম এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি বেঁচে থাকতে গ্রামে এ সব কি হচ্ছে?"

আমার সমস্ত যুক্তি, সমস্ত বক্তৃতা তিনি নীরবে শুনিলেন; পরে অবিচলিত সন্তোষের সঙ্গে মৃদু হাস্যপ্রভায় বদন মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া গম্ভীর অথচ স্নিগ্ধকণ্ঠে আমাকে বলিলেন, "সব বুঝি, বাবা, বুঝি যে খ মুনশী এখনও তার বাংলা ঘরে ব'সে শুধু ইশারায় একটু মানা ক'রে দিলে পেশোয়ারী বোগদাদী কোনও মৌলভী মৌলানার সাধ্য নাই যে গ্রামে এসে ফেতনা পয়দা করে, কিন্তু আল্লার ঘর জেয়ারত ক'রে ফিরার পর হ'তে এই সমস্ত পরহেজ ক'রে চলছি। আর আমরা হাদীছ কোরানের কি বুঝি, তাই বলি, বাবা, যে ও সবের আলোচনা শুনতে গিয়ে শেষে গুনাহগার হব। তাই অন্য গ্রামে গিয়ে জুমার নামাজ পড়ি; বাকী সময়টা নিজ ঘরে ব'সে আল্লা আল্লা করি। আমার ইমানটা তাজা রাখতে দাও, বাবা, আর আমাকে এ সবের ভিতর জড়িও না।"

মুনশী সাহেবের বাড়ী হইতে ফিরিবার পথে পাশের গ্রামের একজন বলিল, "আগেই ত বলেছিলাম, মুনশী সাহেবের কাছে গিয়ে কোন ফায়দা হবে না। তিনি এখন এ সবের অনেক উপরে, পরহেজগার —ফেরেস্তা!"

(৩)

পাঠ্য জীবনে সহপাঠী গ মিঞার বাড়ীতে অনেকবার গিয়াছি, দুই একদিন থাকিয়াছি। গ মিঞার পিতা ঘ সরকার ছিলেন তখন দশ গাঁয়ের পঞ্চায়েত, সাত গাঁয়ের তহশীলদার, নিকটবর্ত্তী জলা মহল সমূহের ইজারাদার এবং গ্রামের সমবায় ঋণদান সমিতির সেক্রেটারী। বর্ষায় তিনি পাটের কারবার দিতেন, বৎসরের বাকী সময় তাঁহার বড় বড়

তিনটি নৌকা ধান চাউল সরিষার কারবারে নিযুক্ত থাকিত। বাড়ীতে জোত খামারও মন্দ নয়; তিনটি কামলা বার মাস খাটিত। মাঝারি ধরণের একটি বাড়ী, অন্দরে চার ভিটায় চারটি বড় ছোনের ঘর, বাহিরে ছোনের আট চালা বারান্দা-দার বাংলা; টীনের দোচালা লম্বা গোশালা গরুভরা; গোশালার পাশে খড়ের বড় বড় পালা। চৌকিদার, দফাদার, পিয়াদা, বরকন্দাজ, জেলে, ফড়িয়া, বেপারী, কামলা জামলা, মুছাফির মেহমান বাংলা ঘরটিকে অষ্টক্ষণ গরম করিয়া রাখিত। সন্ধ্যার পর বাংলা ঘরের এক কোঠায় সরকার মহলের কাগজ পাতি লইয়া বসিতেন, হল কামরায় মেহমান মুছাফিররা কখনো গল্প গুজারী, কখনো পুঁথি পাঠ, কখনো জেকের আজকার করিতেন, বারান্দার কোনে কামলা হারুচাচা পাড়ার ছেলে ছোকরাদিগকে লইয়া বাহারাম বাদশার কেচ্ছা কহিতে বসিয়া যাইত; অন্য কোনে কামলা শের আলী হুকায় লম্বা লম্বা টান দিয়া জোরে জোরে 'তাইতা' কাটিত ও মাঝে মাঝে মধুমালার বিরহের রাগিনী কণ্ঠে ফুটাইয়া টাকুরে তাইতা গোছাইত এবং তিন মাইল দূরে তাহার বাড়ীর দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস সহ ধড়াস করিয়া টাকুরটা রাখিয়া দিয়া হুকায় আর কয়েকটা টান কষিয়া দিত। ছোকরা কামলা নুরা গরুর গাড়িতে খড় কাটিয়া দিত, সরকারকে তামাক খাওয়াইত, মেহমান মুছাফিরের খবর লইত এবং বাড়ীর চাকরাণী পচার মায়ের সঙ্গে কোন্দল করিত। গ্রামের অন্য লোকদের অবস্থা মোটের উপর বেশ স্বচ্ছল ছিল, চাষবাসের কাজ, ছোট ছোট কাজ কারবার এমনই রকমে তুকতাক করিয়া সকলে সুখে শান্তিতে, আনন্দে ছিল।

প্রায় বার বৎসর পর গ্রামের পাশ দিয়া যাইতে গ মিঞার সঙ্গে দেখা। তাহাকে চিনিতে বেগ পাইতে হইল, একে ত বার বৎসরের ব্যবধান,

তাহার উপর তাহার পোষাকে চেহারায় এত পরিবর্ত্তন! তাহার সেই নিত্য হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল এখন বিরস, ঔদাস্য মাখা ; তাহার চির চঞ্চল গতি অস্বাভাবিকরূপে মন্থর, পায়ে খড়ম, পরণে কারিগরের তৈয়ারী মোটা ডোরাদার কাপড়ের পাজামা হাঁটুর সামান্য নীচে নামিয়া থামিয়া গিয়াছে, গায় তিন পোয়া জামা, দাড়ি লম্বা, গোঁফ কৃষ্ণ রেখা মাত্র, মাথায় বাবরী, তদুপরি তালপাতার টুপী, হাতে একটা মোটা মেছওয়াক। প্রথম যৌবনের প্রিয় সহপাঠী, কত কথাই তাহার সঙ্গে হইল ; দেখিলাম তাহার হৃদয় এখনো তেমনি প্রীতিময়, তাহার চক্ষু এখনো মাঝে মাঝে আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আমাদের কথা বলার মাঝে মাঝে সে চার বার হঠাৎ উচ্চ উদাস কণ্ঠে 'মাবুদ', 'মাবুদ' বলিয়া হাঁকিয়া উঠিয়াছে। আমি সন্দিগ্ধভাবে তাহার দিকে মুখ তুলিয়া দেখিয়াছি ; দেখিয়াছি, তাহার মুখে চোখে নির্ম্মল সরলতা, তথায় কপটতার লেশ মাত্র নাই।

কহিলাম, "ভাই, তোমার বাপজীর সঙ্গে দেখা না ক'রে যাওয়াটা আমার বড় অন্যায় হ'বে, কি বল?" সে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিল না, তবু তাহাকে লইয়া তাহাদের বাড়ী গেলাম।

কিন্তু একি! এ বাড়ী ত সে বাড়ী নয় ; এ ঘ সরকারও ত সে ঘ সরকার নয়। গ মিঞা চিনাইয়া দেওয়ায় ঘ সরকারকে চিনিলাম। তিনি বাড়ীর সামনে গাছতলায় একটা ভাঙ্গা মোড়ায় বসা, সামনে একটা ছেঁড়া চাটাইয়ে পাঁচ সাত জন লোক বসা ; সবারই পোষাক মোটা-মুটি গ মিঞার পোষাকের অনুরূপ, চেহারা চুল, দাড়ি গোঁফও তদ্রূপ, উপরন্তু কাহারও কাহারও হাতে বা গলায় তছবীহ্।

আমি তাঁহাকে আদাব দিয়া কাছে দাঁড়াইলে তিনি যেন একটু বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ী কোথায়?" উত্তর দিলাম।

"নাম"? তাহাও বলিলাম। "কি প্রয়োজন"? কহিলাম, "প্রয়োজন কিছুই নয়, কেবল আপনাকে ছালাম করা।" "বেশ বসুন।" বসিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন বলিয়া বোধ হইল না। চিনিবার চেষ্টা তিনি করিলেন না। আমার সঙ্গে আর কোন কথা না বলিয়া উপস্থিত আর সকলের সঙ্গে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন। বসিয়া বসিয়া অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম; মনে হইল, আমার সঙ্গে ইঁহাদের কোন বিষয়েই মিল নাই; আমার এখানে হাজির হওয়ার উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক নয়, আমার লক্ষ্ণৌবী পাজামা, আটাসাটা কোট, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, ঝাঁটার মত গোঁফ, দশ আনা ছয় আনা চুল, ইহাদের কোনটীর সঙ্গে উঁহাদের কোনটীর মিল নাই। সুতরাং স্বভাবতঃই মনে হইতে লাগিল যেন তাঁহারা মাঝে মাঝে আমার দিকে বিরক্তিপূর্ণ কটাক্ষ করিতেছেন; তাহা আমার গায় সূঁচের মত বিঁধিতে লাগিল। আমি উঠিলাম এবং এবার আচ্ছালামু আলায়কুম বলিয়া বিদায় হইলাম; ঘ সরকার নীরবে বিদায় দিলেন।

বুকে বড় বাজিল। কোন কালের কোন আত্মীয়তা নাই, অথচ পাঠ্যজীবনে আসিয়া তিন দিন থাকার পরও বিদায় চাহিলে এই ঘ সরকার তাঁহার উদার স্নেহময় পিতৃতুল্য বাৎসল্যের ডোরে অন্ততঃ আরও দুই দিন বাঁধিয়া রাখিতেন, এখানে আসিলে বাবার কথা বাড়ীর কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতাম! আর আজ? ওহ্!

বাড়ীর দিকে চাহিয়া চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। আটচালা বাংলা এখন চার চালায় পরিণত, তাহারও চালে ছাউনি নাই, চৌকির উপর ছেঁড়া শতরঞ্জী, সে বারান্দা নাই, সে হারু চাচা, শের আলী, নূরা, সে মেহমান মুছাফির, পিয়াদা পাইক, পাড়ার ছেলে ছোকরার সে

আনাগোনা কিছুই নাই। সে গোয়ালঘর আছে, কিন্তু গরু নাই, অন্দরের ঘরগুলির অবস্থাও বাংলা ঘরের অনুরূপ।

ফিরিয়া আসাকালে গ মিঞাকে ফের ডাকিয়া তাহার নিকট হইতে গত কয়েক বৎসরের বিস্তৃত ইতিহাস যাহা শুনিলাম তাহার মর্ম্ম এই :—প্রায় দশ বৎসর আগে...পুরের হজরত শাহ ছৈয়দ···সাহেব গ্রামে আসেন, ওয়াজ করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন, ছেরাতল মোস্তাকিম সকলের পক্ষেই সহজলভ্য করার জন্য গ্রামের সবাইকে শাগরিদ করিয়া জেকের আজকার শিখাইয়া গ্রামে কড়া শরায়ী শাসনের পত্তন করেন। তিনি শাগরিদ-গণের মধ্যে প্রথম স্থান দেন ঘ সরকারকে, কারণ দুনিয়াবী নানা নাপছন্দ কাজে মস্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁহার ইমান যে নেহায়েত তাজা ছিল তাহা তাঁহার বাড়ীতে দুই বেলা খাইয়াই ছৈয়দ সাহেব স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন। অতঃপর ছৈয়দ সাহেবের এনায়েত করা এই উচ্চপদের ইজ্জত রক্ষার জন্য গত দশ বৎসর যাবৎ সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা ঘ সরকার করিয়া আসিতেছেন। ফলে আল্লার রহমে ও ছৈয়দ সাহেবের দোওয়ার বরকতে তিনি অনেকটা কাম-ইয়াব হইয়াছেন; কারণ ঘ সরকারকে এখন পুরা-পুরি পরহেজগার বলা যায়, গ্রামের বাকী লোকও তাঁহার বেশী পেছনে নয়।

ঘ সরকার তহশীলদারী ছাড়িয়া দিলেন, কারণ খাজনা আদায় করিতে জোর জুলুম করিতে হয়; পঞ্চায়েতী ছাড়িয়া দিলেন, কারণ হিন্দু দারোগার মন যোগাইতে হয়; জল মহালের ইজারা ছাড়িয়া দিলেন, কারণ জলের তলের অদেখা মাছ মাঝিকে বিক্রি দিতে হয়; ঋণদান সমিতি গ্রাম হইতে উঠাইয়া দিলেন, কারণ মুছলমানদের সুদ সংক্রান্ত কোন কাজে যাওয়া শক্ত গুনাহ্; গ্রামিকানরা এখন চালাকী করিয়া কাফের

উমি চাঁদ কাঁইয়ার ঘাড়ে সুদী লেন-দেনের সমস্ত গুনাহের বোঝা চাপাইয়া দিয়াছে, গ্রামের টাকা মুছলমানদের যত এখন সেই জোগায়। পাটে ছল জল আছে, তিনি সে কারবার ত্যাগ করিলেন, ধানে ধূলা, চাউলে কঙ্কর আছে, সে কারবার ছাড়িলেন। আয় কমিল, ব্যয় রহিল, ঘরের টাকা ফুরাইল; কিন্তু জঠর জ্বালা পরহেজের মাহাত্ম্য বুঝিল না। উপায়? গোয়ালের উপর নজর পড়িল—"গরুগুলা বড় নচ্ছার, দিন রাত নাপাক গোবর, না পাক চোনা বাড়ীময় ছড়ায়, এমন বাড়ীতে আল্লার এবাদত হয়? আর তা ছাড়া গরু পেলে হবে কি? একটা পুরা-দস্তুর নামাজী কামলা মিলে না, বাড়ীতে বে-নামাজী শয়তানের আড্ডা সৃষ্টি ক'রে আমি কি শেষে দোজখের রাস্তা খোলাছা ক'রব?" সুতরাং গরু গেল, হাল গেল, কামলা গেল। অবশেষে গরু বেচা টাকাও ফুরাইল। সংসারের অভাব অনটন নগ্নমূর্ত্তিতে দেখা দিল; এবার পরহেজগারীর প্রতি ঘ সরকারের ভক্তি টলিয়া উঠিল। সংবাদ পাইয়া ছৈয়দ সাহেব জলদী আসিয়া হাদিছ কোরাণ হইতে তাঁহাকে পরিষ্কার বুঝাইয়া দিলেন যে ভাঙ্গা ঘরে থাকা, টুটা কাপড় পরা, চাটাইয়ে শোয়া, প্রতি মাসে দুই চার দশ দিন পেটে পাথর বাঁধিয়া থাকা আখেরী পয়গম্বরের ছোন্নত। ঘ সরকার নিজ ভুল বুঝতে পারিয়া তৌবা করিলেন। অতঃপর তিনি ছোন্নতের পুরা পায়রবী করার জন্য কোমর বাঁধিলেন। ছৈয়দ সাহেবের ওয়াজে এবং সরকার সাহেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অনেকেই ইদানীং পরম উৎসাহে ছোন্নতে রছুলের পায়রবী করিতেছেন। খাওয়া খাদ্য সম্বন্ধেও গ্রামিকানরা, বিশেষতঃ ঘ সরকার হালাল হারাম লক্ষ্য করিয়া বিশেষ পরহেজ করিয়া চলেন। বে-নমাজীর সঙ্গে এক ঘরে বা বে-নমাজীর বাড়ীতে, বা

যে নমাজী লোক বে-নমাজী বা মদখোর বা অনুরূপ অহালাল রোজ-গারীদের সঙ্গে খাওয়া খাদ্য করে তাহাদের বাড়ীতে বা তাহাদের সঙ্গে বা তাহাদের দেওয়া খাদ্য ঘ সরকার খান না। বাস্তবিক ইদানীং তাঁহার সঙ্গে বসিয়া খাইবার বা তাঁহাকে খাওয়াইবার উপযুক্ত লোক এ অঞ্চলে খুব কম। পানীয় সম্বন্ধেও ইহারা উদাসীন নহেন। গ্রামের ভিতর একটা লোকাল বোর্ডের কূয়া ছিল, আর সড়কের ধারে একটা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ইন্দারা ছিল, উভয়েরই পানি ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ; কারণ লোকাল বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের টাকায় গবর্ণমেণ্টের টাকা আছে এবং গবর্ণমেণ্টের টাকায় মদ বিক্রির টাকা আছে ; সুতরাং ঐ সব কূয়ার পানি খাইলে 'কল্‌ব' অপরিষ্কার হয়, ওজু করিলে নমাজ নষ্ট হয়। ইহাতে লোকের একটু কষ্ট হইলেও ধর্ম্মের জন্য সে কিছু নয় ; সৈয়দ সাহেব নিজে দেখিয়া আসিয়াছেন যে আল্লার ঘরের দেশের লোক পানির জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশী তক্‌লীফ উঠায়। গ্রামের পাঠশালাটিতে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্য নেওয়া বন্ধ করাতে তাহা উঠিয়া গিয়াছে, ভালই হইয়াছে, উহাতে কাফেরী কালাম রাম সীতার কাহিনী পড়ান হইত। ছেলেরা এখন মছজিদে বসিয়া ইমাম সাহেবের নিকট দীন এলেম হাছেল করে। লোকাল বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় হাঁটা যায় কিনা এ সম্বন্ধেও সরকার সাহেবের দেলে শক পয়দা হইয়াছে ; তিনি ইহার ফয়ছলার জন্য সৈয়দ সাহেবের খেদমতে পত্র পাঠাইয়াছেন। হাটে বেশ্যা আসে, সরকার সাহেব হাটে যান না। গ মিঞা পোষ্টাফিসে কেরাণীর কাজ করিত, সরকার সাহেব তাহাকে চাকুরী ইস্তাফা দিতে বাধ্য করিয়াছেন, কারণ সৈয়দ সাহেব বলিয়াছেন, সরকারী টাকায় অনেক গোল। হাল গরু,

ব্যবসায় বাণিজ্য নাই, এদিকে গ মিঞা বিবাহ করিয়াছে এবং খোদা তিনটি পুত্র সন্তান এবং একটি কন্যা সন্তান দিয়াছেন; আয় নাই, সুতরাং মাঝে মাঝে পেটে পাথর বাঁধিয়া তাহারা ছোন্নতে রছুলুল্লার পায়্রবী করে। জারী, ধুয়া প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার গান, পুঁথি পড়া, লাটিম ঘুরান, ঘুড়ী উড়ান, পাতা চোর খেলা, নৌকা বাইছ প্রভৃতি বে-শরা, বেদ-আত, বে-ফায়দা কারবার গ্রাম হইতে নির্ব্বাসিত। সৈয়দ সাহেব সাফ বলিয়া দিয়াছেন, ছেলেদের সখ হইলে আল্লার কেতাবের ছুরা আবৃত্তি করিতে পারে এবং দরুদ শরীফ পড়িতে পারে; ইহার বেশী আর কিছু নয়—গজলও নয়; বয়স্করা ত এশার নামাজ আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করিয়াই পনর কুড়ি জনে এক এক দল গঠন করিয়া জেকের আজকারে মশগুল হয়।

রাত্রিকালে গ্রামের আধ মাইল দূর দিয়া পথিক যাইতেও স্পষ্ট টের পায় যে—হাঁ, গ্রামে দীনে ইছলামের রওনক্ পূরাপূরিই আছে। জেকের করিতে করিতে কাহারও কাহারও জালালী জোশ পয়দা হয়; তখন তাঁহারা লম্ফনে কুর্দ্দনে ঘর গারত করিয়া দিতে উদ্যত হন। ইতিমধ্যেই গ্রামের দুইটি লোকের জালালী জোশ জিয়াদা হওয়ায় তাঁহারা ঘর দুয়ার ছাড়িয়া 'মাজ্জুব' হইয়াছেন; তাঁহাদের যুবতী স্ত্রী, শিশু পুত্রকন্যা, বৃদ্ধ মা বাপ আল্লার হাওলায় আছে; আল্লা রাজ্জাক, তিনি তাহাদের রেজেকের যে ব্যবস্থা হয় করিবেন। জেকের আজকার খতম করিয়া মুছল্লীরা নিজ নিজ বাড়ী যান এবং শোওয়ার আগে নিজ নিজ নিকাহ্ দোহ্রাইয়া লন, কেননা আল্লার নেক বান্দার পেছনে পেছনে শয়তান লাগিয়াই আছে; কি জানি যদি শয়তান কোন পাকে চক্করে কাহারও দেলে' ওয়াছ ওয়াছা ঢালিয়া দিয়া তাহাকে দিয়া কোন

খারাব কাজ করাইয়া বা কোন ফাহেশা বাত বলাইয়া তাহার বিবি তালাকের কোন কারণ ঘটাইয়া থাকে! গ্রামের দুইটি বেয়াড়া বিবি রোজ রোজ এইরূপ নিকাহ্ দোহ্রান কাজে ঘোর আপত্তি করিয়াছিল; তাহাদের সম্বন্ধে শরীয়তের হুকুম তামিল করা হইয়াছে—তাহারা এখন যার যার বাপের বাড়ী। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে উমি চাঁদ কাঁইয়া সাত 'খাদা' জমি এই মুছুল্লীদের জোত হইতে নিয়াছে; আরও বোধ হয় চৌদ্দ 'খাদা' তাহার হাতে বাঁধা পড়িয়াছে। কিন্তু সৈয়দ সাহেব ফরমাইয়াছেন "কুছ পরোয়া নাই;—দুনিয়ার দৌলত আর হাতের ময়লা, একই কথা। চলে যায় বেহ্তের। দুনিয়ার ধনদৌলত বেদীনের জন্য, ইমানদারের জন্য বেহেশ্ত।"

আমি ধৈর্য্য হারাইলাল; কহিলাম "এখন থামাও ভাই, এই জঘন্য ভীরুতার কাহিনী; আর জিজ্ঞাসা করি, তুমিও কি এই গড্ডালিকা প্রবাহে এমনি ভেসে চলবে?"

গ মিঞা—অর্থাৎ?

আমি—অর্থাৎ এই তোমাদের পরহেজগারী বা ধর্ম্মভীরুতা। শাস্ত্রে, কাব্যে, ইতিহাসে, কাহিনীতে,—কোথাও ভীরুতার প্রশংসা করা হয় নাই, শুধু নিন্দাই করা হয়েছে; সমাজে, রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে, কোথাও ভীরুতা সুফল প্রসব করে নাই, শুধু অহিতই করেছে; অথচ সেই ভীরুতাকে ধর্ম্মের ছদ্মবেশ পরিয়ে নিয়ে তোমরা এই সব অন্যায় অনাচার ক'রে চলেছ।

গ মিঞা—কিন্তু ধর্ম্ম করতে গেলে ভীরুতা চাই-ই এও ত সত্য কথা।

আমি—কখনো সত্য কথা নয়। ফের বলছি, পৃথিবীর কোন ধর্ম্মই বোধ হয় ভীরুতার উৎসাহ দেয় না, ইছলাম ত ভীরুতার পরম শত্রু।

গ মিঞা—কিন্তু আমাদের রছুলুল্লাহ্ (দঃ) কি পরহেজগার ছিলেন না?

আমি—তিনি যাই থাকুন, গ ভাই, তোমরা যাকে পরহেজগার বল, তা তিনি কখ্খনো ছিলেন না। রাম ও সীতার গল্প পড়ান জায়েজ কি না-জায়েজ এই সন্দেহের দোলায় দোল খেয়ে তোমরা পাঠশালা পরহেজ কর; গবর্ণমেণ্টের টাকা নেওয়া জায়েজ কি না-জায়েজ এই সন্দেহে ব্যাকুল-চিত্তে পোষ্ট আফিসের চাকরী ছেড়ে দাও, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় হাঁটা জায়েজ কি না-জায়েজ এই সন্দেহের ভয়ে জড়সড় হ'য়ে পীরের কাছে ফতুয়া জিজ্ঞাসা কর, আর আমার রছুলুল্লাহ্ কি করেছিলেন জান? তিনি তাঁর দেশের তিন শ' ষাটটি খোদার বিরুদ্ধে নির্ভীক চিত্তে বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে দিয়েছিলেন, যখন তিনি ধীরচিত্তে পর্য্যালোচনা ক'রে বুঝতে পেরেছিলেন যে ওরা সব কৃত্রিম খোদা। তিনি যদি তোমাদের মত পরহেজগার হতেন, তবে 'এতগুলি খোদার মধ্যে কি জানি যদি কোনটি সত্য খোদাই হয়' এই ভয়ে তিনি কখনও এ অভিযান করতেন না। তিনি তাঁর দেশের বহু শতাব্দীর 'সনাতন' অন্যায় আচার পদ্ধতি-গুলিকে যেমন নির্ম্মমভাবে পরিত্যাগ করেছিলেন তা কিছুতেই পারতেন না, যদি তিনি তোমাদের মত ভয়ে জড়সড় হ'য়ে ভাবতেন—"কি জানি যদি এইগুলি ভাল আচার পদ্ধতিই হয়?"

গ মিঞা—কিন্তু তিনি ছিলেন আল্লাহর রছুল, তাঁর সঙ্গে কি আমাদের তুলনা হয়?

আমি—যে যে বিষয়ে তিনি আমাদের আদর্শ, সে সব বিষয়ে নিশ্চয়ই তুলনা হয়, এই হিসাবে যে তিনি বা স্বয়ং খোদা এমন কোন কাজ করতে আমাদিগকে আদেশ বা ইঙ্গিত করেন নাই যা আমাদের ক্ষমতার বাইরে।

কিন্তু সে তর্ক থাক, ইমাম বোখারী, ইমাম মুছলিম প্রভৃতি হাদিছ সংগ্রহকারীদের কথাই ধর। হাজার হাজার ছহী হাদীছের সঙ্গে হাজার হাজার জয়ীফ হাদীছ, কেচ্ছাকাহিনী এমন ভাবে মিশে গিয়েছিল যে কোন্‌টি হাদীছ আর কোন্‌টি অহাদীছ তাহা নির্ণয় করা সাধারণের পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠেছিল। উক্ত ইমামগণ তোমাদের মত পুরহেজগার হ'লে পঞ্চাশ মাইল দূর হ'তে ছালাম ক'রে হাদীছ সংগ্রহ কাজ হ'তে এই ব'লে নিরস্ত হতেন যে "বাপরে বাপ, যদি আমাদের ভুলে ছহী হাদীছ দুই দশটি বাদ প'ড়ে যায়, তবে ত জাহান্নামে পুড়তে হবে?" কিন্তু সত্যের সাধক এই মহামনীষীরা সেই ভয়ে ভীত হন নাই; তাঁরা বিপুল সাহসে, বিপুল শ্রমে, বিপুল সাধনায় হাজার হাজার হাদীছ নামধারী অহাদীছকে বাদ দিয়েছেন; এ বাছনীতে দশ বিশ পঞ্চাশটি হাদীছও হয়ত বাদ পড়েছে, কিন্তু সে ভয়ে তাঁরা হাদীছকে আবর্জ্জনা মুক্ত করার মহান ব্রতকে পরহেজ করেন নাই। জগতের ধর্ম্মশাস্ত্রের ইতিহাসে তাঁদের এ সাহস অতুলনীয়।

গ মিঞা—কিন্তু এ পর্য্যন্ত তুমি যা বললে, সব তোমার নিজের সিদ্ধান্ত মাত্র, রছুলুল্লার (দঃ) বাণী একটিও নয়।

আমি—তবে শুন ভাই, তোমার রছুল (দঃ) নিজ কথাতে তোমাদের পরহেজগারীকে অর্থাৎ কোন সন্দেহজনক প্রশ্ন বা সমস্যা সম্মুখে উপস্থিত হ'লে তার সমাধান চেষ্টা না ক'রে তোমাদের মত পলায়ন করাকে কখনো উৎসাহ ত দেনই নাই, বরং উহার সমাধান কল্লে সত্য সাধনার জন্য যে অমর বাণী দান ক'রে গিয়েছেন, তা জগতে ধর্ম্মের ইতিহাসে বিরল, হয়ত বা অতুলনীয়। তিনি ব'লেছেন, কোন সমস্যা সমাধানের জন্য অনুকূল প্রতিকূল উপযুক্ত যুক্তি ও প্রমাণ পর্য্যালোচনা ক'রে যদি কেউ ভুল সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়, তবু তার পুণ্য-

লাভ ঘটে, আর যদি নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তবে তার দ্বিগুণ পুণ্য-লাভ হয়।

বাস্তবিক রছুলুল্লার (দঃ) সমগ্র জীবনের আদর্শ, তাঁর স্পষ্ট বাণী, ছাহাবী, মুহাদ্দিছ ও ইমামগণের আদর্শ, সমস্তই তোমাদের এই সর্ব্বনাশা ভীরুতার তীব্র প্রতিবাদ। জগতে নব নব সমস্যার সমুদ্ভব হচ্ছে, হ'তে থাকবে, সে সবের সমাধান চেষ্টা না ক'রে যদি কাপুরুষের মত পলায়ন ক'রে পরহেজগার হও, তবে ধীরে ধীরে তোমার সমস্ত পথ ঘাট রুদ্ধ হ'য়ে আসবে, আর তোমার পরহেজগারীর খেইয়ে খেইয়ে তোমার চারিদিকে রেশম পোকার গুটীর মত যে অন্ধ কারাগার গ'ড়ে উঠবে, তাতে তোমায় আত্মহত্যা করতে হবে।

মনে রেখো, ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, কোথাও আত্মহত্যার সমর্থন নাই।

শ্রাবণ, ১৩৩৭

কোরবাণী

(১)

গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী আসিয়া মনছুর যখন তাহার চাচি আম্মা নূরন্নেছা ওরফে নূরবিবিকে সংবাদ দিল যে, তাঁহার ছেলে মামুন কলেজ ছাড়িয়া খেলাফৎ আন্দোলনে যোগ দিয়া "আল্লাহো-আকবর", "বন্দে মাতরম্" গাহিয়া বেড়ায়, আর পুলিসের সাথে টক্কর দিয়া চলে, তখন নূরবিবি সহসা হাতের তছবীগাছা জলচৌকীর উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "হায়! হায়! কি হ'ল রে, আমার মামুন কোথায় গেল রে!" পাশের ঘর হইতে মামুনের দাদি-আম্মা পড়িতে পড়িতে ছুটিয়া আসিয়া আছাড়িয়া পড়িল, "হায়, হায় মামুন!" কোণের ঘরে মামুনের ফুফু আম্মা কাঁথা সেলাই করিতেছিল, সে হাতের সুঁচ মেজেয় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া হাত হইতে সুতার প্যাঁচ খসাইতে খসাইতে আসিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "ওরে বাবা মামুন রে, তুই কোথায় গেলিরে!" ঢেঁকি-ঘর হইতে চাকরাণীরা ঢেঁকি বন্ধ করিয়া জুটিয়া তাহাদের কেহ শৃগাল-কণ্ঠে সুর ধরিল, কেউ হাউ-মাউ করিয়া উঠিল, কেউ বা সহানুভূতিতে আঁচলে চোখ ঘসিয়া অশ্রুপ্রবাহ ছুটাইল। মনছুর প্রথমে সকলকে থামাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার উত্তরে নূরবিবি কহিল, "তুই বলিস কিছু হয় নাই, কিন্তু সর্ব্বনাশ হয়েছে রে, বাবা!" নূরবিবিকে সমর্থন করিয়া আর সকলেও উচ্চতরস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিল। তখন মনছুর হতভম্বের মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল; কান্নার রোল শুনিয়া তাহার পিতা আসিতেছেন দেখিয়া সে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

মনছুরের পিতা অনেক কষ্টে ব্যাপারটা বুঝিলেন, ততোধিক কষ্টে ব্যাপারটা যে বিশেষ কিছুই নহে, তাহা বুঝাইয়া সকলকে থামাইয়া চলিয়া গেলেন

তখন আবার মনছুরের ডাক পড়িল,—সকলে এখন শান্তমনে সব কথা শুনিবে। মনছুর আসিয়াই কহিল, "আমি ওসব কিছুই বল্‌তে পারব না, চাচি-আম্মা, আপনারা আসল কথা না শুনেই চীৎকার শুরু ক'রে দিয়েছিলেন, তাতে আবার একটা কথা ব'লে নূতন গোল বাধাই, আর বাপজী এসে আমাকে মার দিন।"

নূরবিবি কহিল, "বল্ না বাবা বল, আর আমরা কাঁদব না ; তুই কথা বুঝিয়ে বলতে জানিস্ না, তাই ত এত গোল।"

মনছুর কহিল, "জি হাঁ, এক ভলান্টিয়ার হওয়ার কথা শুনেই এত চীৎকার, আর মামুন যে সিপাই হ'য়ে আঙ্গোরায় লড়্‌তে যাচ্ছে সেকথা"—কথা শেষ হইবার অবসর হইল না ?

মা, ফুফু, দাদি সমস্বরে প্রশ্ন করিল, "কি—কি—কি ?"

"কি আর এমন, সে তুরস্কের পক্ষে লড়াই করতে যাবে।"

এবার নূরবিবি গলা ফাটাইয়া চীৎকার ছাড়িল—"হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ হ'লরে, ছিপাইয়ে ধরে মারল, ওরে আমার বাছারে!"

আবার রোজ কিয়ামতের ক্ষুদ্র অভিনয়ে সকলে যোগ দিল, আবার পাড়ার মেয়েরা, রাস্তার ছেলেরা ছুটিয়া আসিল, আবার পাকের ঘরে বিড়ালের ভোজ, ঢেঁকি ঘরে মুরগীর মহোৎসব হইল, আবার মামুনের ফুফু আম্মার কাঁথার সূঁচ হারাইল, আবার মনছুরের বাপ আসিয়া কান্নার রোল থামাইল।

(২)

পরদিন কলিকাতা লোক পাঠাইয়া মামুনকে বাড়ীতে আনা হইল। মামুন বাড়ীর দেউড়ী পার হইতেই নূরবিবি কাঁদিয়া আসিয়া তাহাকে বুকে লইল—"ওরে বাবা, তুই এতদিন কোথায় ছিলিরে, বাবা!" অন্দর-মহলে বিলাপ উৎসবের লোকের অভাব হয় না, এখানেও হইল না। অন্য মেয়েরাও ত্বরিত গতিতে আসিয়া কান্নার স্বরে স্বর মিলাইল। মনছুরের পিতা আবার খবর নিতে আসিয়া দেখিলেন, নূরবিবি মামুনকে কোলে করিয়া উঠানে বসিয়া আছে এবং তাহাকে ঘিরিয়া সকলে চীৎকার করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া নূরবিবি মাথার ঘোম্‌টা টানিতে টানিতে কাঁদিয়া হাসিয়া কহিল, "আমার মামুন আসিয়াছে।"

কান্না থামিলে মামুনকে রেহাই দিয়া নূরবিবি উপস্থিত মহিলাগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "খোদার কুদ্‌রত বোঝা ভার, নইলে দেখ ত, আমি যেমন ওনার সাথে হজে যাওয়ার জেদ ধরেছিলাম, তাতে উনিও যদি স্বীকার করতেন, তবে আজ কে আমার বাছাকে রক্ষা করত? আমরা হজে থাক্‌তাম, এদিকে ও লড়াইয়ে গিয়ে মরত! (শাড়ীর আঁচলে অশ্রুমোচন)। আমার চারিটি বৈ ত দশটা ছেলে নয় (কণ্ঠ পরিষ্করণ)। আর হাজার হলেও মরদের বুদ্ধিই আলাদা; আমি যতই ওনাকে বল্লাম, সাথে আমাকেও নিতে হবে, উনি ততই আমাকে বল্লেন, "না, তুমি থাক।" আর খোদাও আমাকে শেষে বুদ্ধি দিলেন; আমিও পরে ওনাকে বল্লাম, "আচ্ছা, আমি থাকি।"

সকলে বলিল—"ইহা খোদার কুদরত।"

নূরবিবি পুনরপি কহিল, "আচ্ছা দেখ ত বু'জি, ছেলেরই বা আমার আক্কেলটা, আমরা দিয়েছি তোকে পড়তে, তা সে সব ছেড়ে তোকে

বাজে কাজে নেচে বা লাভ কি? আর লড়াইয়ে যাবারই বা এত সখ কেন? আল্লার ধর্ম্ম যদি আল্লাহ্ রক্ষা না করে, তবে মানুষ কি তা পারে?"

সকলে সমর্থন করিয়া কহিল, "তা কি পারে?"

"আসল কথা—এখনকার ছেলেগুলাই হচ্ছে অবাধ্য", এই বলিয়া সকলে নিজ নিজ ছেলের দুরন্তপনার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইল এবং যাহাদের বিবাহিত ছেলে আছে, তাহারা সে অলক্ষ্মী ছেলেগুলার অকারণ স্ত্রী-ভক্তির আতিশয্যের কথা তুলিয়া অনেক দুঃখ করিল।

হাছনা বিবি প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "কিন্তু ছেলেও আছে, ছেলেও নাই। আমার হেনাকে যে বিয়ে দিয়েছি, অমন ছেলে আর হয় না, জামাইটি হেনার কথা ছাড়া কিচ্ছু করবে না, যেন তার বাঁধা গোলাম!" উপস্থিত সকলে একবাক্যে এ কথার সমর্থন করিল।

(৩)

ঈদ আসিল—হজের ঈদ। গরু, খাসী খুব সকালে ধোয়াইয়া আনিয়া রাখা হইয়াছে। নূরবিবি রোজা রাখিয়াছে, কোরবাণী হইলে তার রোজা ভাঙ্গিবে। নূরবিবি ফজরের নামাজ পড়িল, কোরাণ শরিফ পাঠ করিল; তারপর তছবী হাতে লইয়া মামুনকে ডাকিয়া কহিল, "ওনার হজ খোদার ফজলে হ'ল আর কি?"

"হাঁ, মা।"

'আচ্ছা, আমাকে হজের পুণ্যের কথা কিছু পড়ে শোনা ত বাবা!"

মামুন হজের ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতে লাগিল। মুগ্ধচিত্তে শুনিতে

শুনিতে নূরবিবি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বিষন্ন কণ্ঠে কহিল, "আচ্ছা,—তোর বাবাকে খোদা মঙ্গল মতন ফিরিয়ে আনুন, কিন্তু—"

মায়ের এই হঠাৎ ক্ষুন্নকণ্ঠে বিস্মিত হইয়া মামুন জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু—কি মা ?"

নূরবিবি রাগতস্বরে কহিল "নে বাপু আর বকিস্ নে; বাপটি এত কহা বলা সত্ত্বেও আমাকে বাড়ী ফেলে নিজে একেলা হজ্ব করতে গেলেন, আবার তার জন্য কিছু একটু বলেছি না ত ছেলে অমনি কৈফিয়ৎ তলব করছে! কেন বাপু, মেয়ে মানুষের পুণ্য করবার অধিকার কি খোদায় দেয় নাই ?"

মামুন ক্ষুন্ন হইল এবং বিনয়নম্রস্বরে কহিল, "কেন মা, মেয়েদেরও ত পুণ্য করার যথেষ্ট সুযোগ আছে, নামাজ, রোজা জাকাত, কোরবাণী দান খয়রাত সব ত তারা করতে পারে ?"

নূরবিবি কহিল, "নে বাপু, আর বাপের পক্ষে ওকালতী করতে হবে না; এখন শুনাবি ত কোরবাণীর কথা কিছু শোনা !"

মামুন প্রসন্নচিত্তে কোরবাণীর কথা শুনাইতে লাগিল। কিরূপে হজরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, কিরূপে ছেলে কোরবাণীর ইঙ্গিত হইল, কিরূপে তিনি পুত্রকে গোছল করাইয়া সাফ কাপড় পরাইয়া অঙ্গে সুগন্ধি মাখিয়া আল্লার উদ্দেশ্যে পুত্রকে উৎসর্গ করিতে ময়দানের দিকে চলিলেন, কিরূপে শয়তান বিবি হাজেরাকে 'দাগা' দিতে আসিল এবং আল্লার নামে পুত্র কোরবাণী হইবে শুনিয়া হাজেরা বিবি কিরূপ খুশী হইলেন ও শয়তানকে তাহার কুপরামর্শের জন্য তাড়াইয়া দিলেন, মামুন সমস্তই পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। মুগ্ধচিত্তে শুনিতে শুনিতে নূরবিবি হঠাৎ প্রশ্ন করিল, "হাজেরা বিবির কয়গণ্ডা পুত্র ছিল রে মামুন ?"

"মাত্র একটি।"

নূরবিবি চমকিয়া উঠিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "মাত্র একটি ?"

মামুন বলিল "হাঁ মা, তাও দুঃখিনীর বুকের ধন।" মামুন হাজেরার নির্ব্বাসন ও ইছমাইলের জন্মকথা শুনাইলে নূরবিবি জিজ্ঞাসা করিল, আর সেই পুত্রকে বিবি হাজেরা খুশী হ'য়ে কোরবাণীর জন্ম পাঠালেন ?"

মামুন কহিল, "হঁা মা, সেই জন্যই ত আজ দুনিয়ার সর্ব্বস্থানে ঈদের মাঠে মাঠে হাজেরার কীর্ত্তি কাহিনী ঘোষিত হয়—আর সেই জন্যই ত কোরবাণীর এত পুণ্য মা!"

নূরবিবি কহিল, "আচ্ছা, পড় বাবা।"

মামুন পড়িতে লাগিল; নূরবিবি অন্যমনস্ক ভাবে কিছুক্ষণ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, দেখ মামুন, পুত্রের পরিবর্ত্তে দুম্বা কোরবাণী হওয়ায় বড় ভাল হয়েছে, নয় কি? নইলে ত মানুষের আর কোরবাণীর পুণ্য লাভ ঘটত না। এখনও যদি পুত্র কোরবাণীর নিয়ম থাকত, তবে কি আর কেউ বিবি হাজেরার মত তা করত ?"

মামুন কহিল, "করত মা, করত; সবাই না করুক, কোন কোন মা করত। এইত এখনও তুর্কী মায়েরা পুত্রের গায়ে যুদ্ধের সাজ পরিয়ে দিয়ে শহীদ হবার জন্য লড়াইয়ের ময়দানে পাঠায়। শহীদের দর্জ্জা ত কম দর্জ্জা নয়!"

নূরবিবি কহিল, "আচ্ছা, পড়ে যা বাপ।"

মামুন পড়িতে লাগিল, নূরবিবি বসিয়া রহিল, কিন্তু শুনিল কি না বলা যায় না, কারণ তাহাকে বিশেষ অন্যমনস্ক দেখা গেল। কিছুক্ষণ পরে নূরবিবি কহিল, "নে বাপু, এখন এসব রেখে দে, বড় মাথা ধরেছে।"

মামুন বই বন্ধ করিতে করিতে কহিল, "মা, তবে একটু শরবৎ খেয়ে- নাও না, মাথা ছেড়ে যাবেখন।"

নূরবিবি কহিল, "দরকার নাই শরবত টরবতের, বাপ, তুই গল্প বল, আমি শুনি। আচ্ছা, এই যে তুরস্কের পক্ষে লড়াইয়ে যাওয়ার কথা সব মানুষে কয়, এটা আবার কি রে বাপ?"

মামুন বুঝাইয়া কহিল, ইছলাম ধর্ম্মের বিপদ, ইছলামকে রক্ষা করতে এখন যে লড়বে, সে জেহাদের ছওয়াব লাভ করবে।

"তা এতদূর থেকে কি আর লোকে যাবে?"

"কেন যাবে না, এই ত বাংলা দেশ হ'তে দশ হাজার স্বেচ্ছা সৈনিকের আঙ্গোরায় যাওয়ার প্রস্তাব হয়েছে, এই ত আমি যেতে চেয়ে-ছিলাম, কিন্তু যখন তোমার কথামত বাড়ী চলে এলাম, সকলে কত ঠাট্টা করল।"

নূরবিবি সংক্ষেপে কহিল, "হুঁ, তা ত করবেই। আচ্ছা, তুই এখন যা বাপ, ঈদের জন্য তৈয়ার হ। কিন্তু দেখ্ মামুন, তোর বাপজী চিরদিনই আমায় পুণ্য কাজে ঠকিয়েছেন,—দান, খয়রাত, হজ, সব তাঁরই একা।"

নূরবিবি গম্ভীর হইয়া উঠিয়া গেল।

৪

ঈদের নামাজের পর মাঠ হইতে আসিয়া মামুন কিছু নাশ্‌তা খাইলে নূরবিবি তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "তোকে একটা কথা বলব, মামুন, শুনবি বাপ?"

মামুন কহিল, "কি মা, তোমার কি কখনও অবাধ্য হয়েছি ?"

নূরবিবি বলিল, "তবে শোন্, বাছা, তোকে আমি তুরস্কে লড়াইয়ে পাঠাইতে চাই, আজই কলিকাতা রওনা হবি।

মামুন বিস্ময়-অবিশ্বাস-দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিলে নূরবিবি বলিল, "অবিশ্বাসের কিছু নাই, বাছা, সত্য বলছি।"

মামুনের মুখ আনন্দে উৎসাহে জ্বলিয়া উঠিল, সে মায়ের কদমবুছি করিয়া কহিল, "খুব তৈয়ার আছি মা, খুব। আপনি একটু নাশ্‌তা খেয়ে নিন, তারপর আমি বিদায় হই।"

নূরবিবি বলিল, "না বাবা, আমি তোকে বিদায় করে দিয়ে তবে মুখে পানি দিব, তার আগে নয়। তুই কলিকাতা গিয়ে সৈন্যদলে ভর্ত্তি হয়ে চেষ্টাচরিত্র করে তুরস্কে গিয়ে ইছলামের জন্য যুদ্ধ কর্‌। বিবি হাজেরা তাঁর একমাত্র পুত্রকে কোরবাণী করতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, আর আমি ইছলামের এই দুর্দ্দিনে চারি পুত্রের একটিকেও আল্লাহর রাস্তায় না পাঠিয়ে ঈদের দিন খাব? তুই কাপড় নিয়ে আয়, আমি নিজে তোর গায়ে জামা পরিয়ে দিব।"

কথা বিদ্যুতের মত বাড়ীতে, পাড়ায় ছড়াইয়া পড়িল। দলে দলে মেয়েরা আসিয়া অন্দর পূর্ণ করিল। মামুন জামা, কাপড় লইয়া আসিল। বাড়ীর ও পাড়ার মেয়েরা দাঁতে জিহ্বা কাটিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও মামুনের মা, তুমি কি বুড়ো বয়সে পাগল হ'লে, পেটের ছেলেকে যমের মুখে তুলে দিচ্ছ ?"

নুরবিবি তীব্রকণ্ঠে উত্তর দিল, "এখন যারা আমার কাজে বাধা দিবে, বিবি হাজেরার মত আমি তাদেরকে শয়তান বলে তাড়িয়ে দিব।"

মামুনের বড় ভাই আমিন আসিয়া বলিল, "মা, আপনি যে কাজে

ওকে পাঠাচ্ছেন, সে ত খুব ভাল কাজ, আমরা তাতে বাধা দিব না, কিন্তু বাঙ্গালী সৈন্যেরা এখনই তুরস্কে যাচ্ছে না; আর বাপজী শীঘ্রই ফিরে আস্ছেন, বাপজীর জন্য কয়টা দিন দেরী করলে হয় না?"

নূরবিবি মামুনের গায়ের জামা পরাইতে পরাইতে শান্তকণ্ঠে কহিল, "তোর বাপজীর জন্য তোদের আর তিন ভাইকে রেখে দিলাম, এটি তোরা আমাকে দে।"

আষাঢ়, ১৩৩১